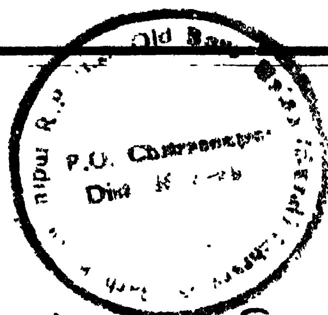
অনিল মুখার্জী



সাম্যবাদের ভূমিকা

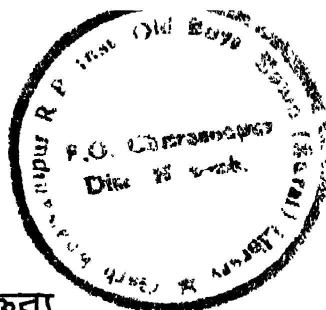
পূরবী পাবলিশার্স
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
ডিসেম্বর ১৯৪২
দ্বিতীয় সংস্করণ
জুলাই ১৯৪৫

প্রচ্ছদপট শিল্পী : আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক : গিরীন চক্রবর্ত্তী
পূরবী পাবলিশার্স
৩৭।৭, বেণিয়াটোলা লেন
মুদ্রাকর : কিশোরীমোহন নন্দী
গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭, বেণিয়াটোলা লেন
কলিকাতা।

দাম পাঁচ সিকা



প্রকাশকের বক্তব্য

মার্কস্‌বাদ বুঝতে বেশ কষ্ট হয়—আর সহজে বোঝাবার মত করে কেন যে বই লেখা হয় না তাই হ'ল সাধারণের প্রধান অভিযোগ। অনিলবাবুর বইটি—পাঠকদের সে অভাব পূরণ করতে পারবে বলেই মনে হয়।

প্রথম সংস্করণের পরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্ত্তন ঘটেছিল তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লেখক বইটিকে আরও আধুনিক করে দিয়েছেন। সে জন্যেই প্রথম সংস্করণের পরিশিষ্ট বদলিয়ে—নতুন জিনিস দিয়েছেন। আজ ইওরোপের ফ্যাশিস্ট-শক্তির প্রতীক জার্মানীর নাৎসীরা পরাজিত। সোভিয়েটের শৌর্য্যেই এত বড় জয় সম্ভব হয়েছিল, কাজেই ভারতের জাতীয়তার দৃষ্টিতে সে জয়ের তাৎপর্য আমাদের জানা দরকার। তাই এই পরিবর্ত্তন।

শেষ অধ্যায়ের জন্য ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সীর ঋণ স্বীকার করছি "কার জয়" অনুসরণ করায়।

গ্রন্থকারের প্রথম সংস্করণের

ভূমিকা

নারায়ণগঞ্জের কাপড়-কল অঞ্চলে যে শ্রমিক আন্দোলন চলিতেছিল, ১৯৩৯ সালের প্রথমদিকে আমি সেই আন্দোলনে যোগদান করি। ক্রমে আমরা যখন শ্রমিক-বন্ধুদের সাথে মার্কস্‌বাদ (সাম্যবাদ) সম্বন্ধে রীতিমত আলাপ আলোচনা, পড়াশুনা সুরু করি, তখন এই সম্বন্ধে কোনও সম্পূর্ণ এবং সহজপাঠ্য বাংলা পুস্তকের অভাবে বড়ই অসুবিধা হইত। আমাদের দরকার হইল, এমন একটি পুস্তক যাহাতে মোটামুটি মার্কসীয় মতবাদ লিপিবদ্ধ আছে, যাহাকে ভিত্তি করিয়া ক্লাস করা চলে এবং যে পুস্তক শ্রমিক-বন্ধুগণ তাহাদের সামান্য অবসর সময়ে নিজেরা পড়িয়াও মার্কস্‌বাদ সম্বন্ধে কিছুটা সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে পারে। "কমিউনিষ্ট ম্যানিফ্যাষ্টোর" অনেকগুলি বাংলা অনুবাদ হইয়াছে সত্য, কিন্তু এইগুলি সবই কঠিন। কম্‌রেড নেপাল নাগ আমাকে আমাদের কাজ চালাইবার মত একটি পুস্তিকা লিখিতে বলেন এবং আমরা দুইজনে এইজন্য কতকগুলি সূত্র ঠিক করি। দুই একজন শ্রমিক-বন্ধুও এই সম্বন্ধে জোর তাগিদ দিতে থাকেন। কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত লেখা সুরু করিতে পারি নাই; পরে সুরু করিয়াও নানা কাজের চাপে ইহা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হই এবং ক্রমে এই আশা এক রকম ত্যাগ করি।

ইতিমধ্যে নানা কারণে যথেষ্ট অবসর সময় মিলিয়া যাওয়ায় পুস্তক সম্পূর্ণ করিবার সুযোগ ঘটে। ছোট বড় অনেক লেখকের লেখা হইতেই সাহায্য নিয়াছি। দ্বাদশ অধ্যায় "দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ" প্রায় সম্পূর্ণটাই কম্‌রেড ষ্ট্যালিনের লেখা "Dialectical and Historical Materialism" নামক পুস্তিকা হইতে গৃহীত।

যাঁহারা মার্কস্‌বাদের উৎসাহী ছাত্র তাহাদের সুবিধার জন্য প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে কয়েকটি করিয়া আদর্শ প্রশ্ন দেওয়া হইল।

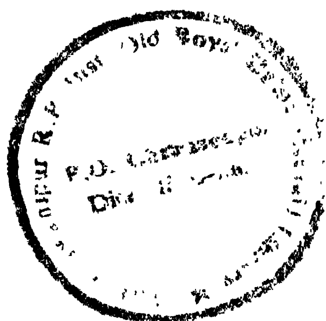
যাঁহাদের উদ্দেশ্যে এই পুস্তক রচিত তাঁহারা, বিশেষতঃ গণআন্দোলনের কর্ম্মী ও জনগণ যদি এই পুস্তকের সাহায্যে বিন্দুমাত্রও উপকৃত হন, তাহা হইলে পরম তৃপ্তি অনুভব করিব।

পরিশেষে, যাঁহাদের আগ্রহ, উৎসাহ এবং সাহায্যের ফলে এই পুস্তক লেখা ও প্রকাশ করা সম্ভবপর হইয়াছে, তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই পুস্তকখানা প্রায় সম্পূর্ণই লেখা হয়, বর্ত্তমান জনযুদ্ধের পূর্ব্বে, ১৯৪০ সালে। নানা অসুবিধার জন্য তখন ইহা প্রকাশিত করা সম্ভবপর হয় নাই। এখন, পূর্ব্বে যাহা লেখা হইয়াছে, সম্পূর্ণ তাহাই রাখা হইল; শুধু নূতন পরিস্থিতি বিবেচনায় পুস্তকের শেষে একটি পরিশিষ্ট দেওয়া হইল, জনযুদ্ধের যুগে উপনিবেশের জনগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আভাস দিয়া।

মুন্সীগঞ্জ
৭ই আগষ্ট, ১৯৪২

অনিল মুখার্জ্জী



সূচী

এক

সাম্যবাদ ভালভাবে বুঝিতে হইলে যাঁহারা এই সমাজ-দর্শন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাঁহারা ইহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা আমাদের জানা থাকা দরকার। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ জার্ম্মান দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইউরোপে তখন মহাবিপ্লব চলিতেছিল। সেই বিপ্লব ও পরিবর্ত্তনের মধ্যে তাঁহাদের জীবনের সুরু। ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা—স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ তখন জার্ম্মানীতে আসিয়া পৌছিয়াছে। আর, মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ ছিলেন ফরাসী-জার্ম্মান সীমান্ত অঞ্চলের ছেলে। সুতরাং শৈশবেই তাঁহাদের মন বিপ্লবী অনুপ্রেরণা পায় এবং তাঁহারা বিপ্লবী আদর্শে গঠিত হন। মার্কস্ এঙ্গেলস্-এর চাইতে কয়েক বৎসরের বড়। কিন্তু বিপ্লবী আদর্শের ঐক্য তাঁহাদের মধ্যে এমন নিবিড় প্রেম ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়াছিল, এমন দরদের সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই মিলে। মার্কসের পিতা ছিলেন উদার-নৈতিক ভাবাপন্ন মধ্যবিত্ত ইহুদী ভদ্রলোক, এঙ্গেলস্-এর পিতা ছিলেন খুব গোঁড়া রক্ষণশীল খৃস্টান মিল মালিক।

বিপ্লবী রাজনৈতিক মতবাদ পোষণ করিবার অপরাধে মার্কস্ স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হন। নির্ব্বাসিত জীবনের বেশীর ভাগ সময় তিনি ইংলণ্ডের লণ্ডন সহরে কাটাইয়াছেন। যে রকম অভাব অভিযোগের ভিতরে মার্কস্‌কে স্ত্রীপুত্রাদি-সহ জীবন যাপন করিতে হইয়াছে, তাহা ভাবিতেও কষ্ট হয়। আমেরিকার এক প্রগতিশীল পত্রিকার সংবাদদাতা হিসাবে তিনি মাসিক সামান্য কিছু উপার্জ্জন

করিতেন এবং এঙ্গেলস্ মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য পাঠাইতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের সুখ সুবিধাকে মার্কস্ অতি তুচ্ছ ব্যাপারই মনে করিতেন। মার্কসের পত্নী বিশেষ ধনী গৃহের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সারা জীবন স্বামীর সঙ্গেই দুঃখ ভোগ করিয়াছেন এবং অভাব অনটনের ভিতরেও মার্কস্‌কে উৎসাহ যোগাইয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ "পুঁজি" (Capital) রচনা করিবার পর মার্কস্ এঙ্গেলস্‌কে যে পত্র লেখেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, "এই কাজে আমি আমার স্বাস্থ্য, সুখ ও পরিবারকে বিসর্জ্জন দিয়াছি।" অসহ্য দারিদ্র্য, চিররোগ, শৈশবেই দুইটি ছেলের মৃত্যু এবং অসম্ভব পরিশ্রমজনিত আদরিণী স্ত্রীর ভগ্ন স্বাস্থ্য, ইহাদের কিছুই তাঁহাকে নিরুদ্যম করিতে পারে নাই। এবং অনেকটা তাঁহার স্ত্রীর গুণেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল।

মার্কস্ তাঁহার নির্ব্বাসিত জীবনের পুরাপুরিই ব্যয় করিয়াছেন সাম্যবাদ প্রচার-কার্য্যে এবং বিপ্লব সংগঠনের চেষ্টায়। ১৮৪৬-৪৭ সালে তাঁহারই অশেষ চেষ্টার ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীদের নিয়া "কমিউনিস্ট (সাম্যবাদী) লীগ" গঠিত হয়। এই লীগেরই নির্দ্দেশ অনুযায়ী ১৮৪৮ সালে মার্কস্ এবং এঙ্গেলস্ লীগের ইস্তাহার "সাম্যবাদীর ফতোয়া" (Communist Manifesto) রচনা করেন। পরবর্ত্তী যুগে এই সাম্যবাদীর ফতোয়াই দুনিয়ার সর্ব্বত্র সাম্যবাদী আন্দোলনের ভিত্তি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে আমরা পাই মানব সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাস, বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের উৎপত্তি ও তাহার অসামঞ্জস্য এবং কি ভাবে শ্রমিকশ্রেণী এই ধনতান্ত্রিক সমাজকে ধ্বংস করিয়া নূতন সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবে এবং কি ভাবে বর্ত্তমান সমাজের গলদ ও অসামঞ্জস্যগুলি দূর করিবে তাহার নির্দ্দেশ। এই নির্দ্দেশ প্রতিপালনের জন্য তাঁহারা জগতের সকল শ্রমজীবিকে একত্রিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে আহ্বান করিয়াছেন।

১৮৬৪ সালে মার্কস্ "আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ" (International Workingmen's Association) প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা "প্রথম আন্তর্জ্জাতিক" (First International) নামে পরিচিত। সাম্যবাদী

মতানুযায়ী দুনিয়ার সর্ব্বত্র শ্রমিক আন্দোলন পরিচালিত করা ও শ্রমিকরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ছিল প্রথম আন্তর্জ্জাতিকের উদ্দেশ্য। ১৮৭১ সালে শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম রাষ্ট্র "প্যারী কমিউনের" (Paris Commune) পতন হইলে প্রথম আন্তর্জ্জাতিক ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। ইহার বহুদিন পর, মার্কস্-এর মৃত্যুর পরে ১৮৮৮ সালে, এঙ্গেলস্-এর অক্লান্ত চেষ্টায় "দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক" নামে শ্রমিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। কিন্তু এঙ্গেলস্-এর মৃত্যুর পর এই প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের বিপ্লবী আদর্শ ও ভাবধারা হারাইয়া ফেলে। রুশ বিপ্লব জয়যুক্ত হইবার পর, ১৯১৯ সালে লেনিন "সাম্যবাদী আন্তর্জ্জাতিক" (Communist International) বা "তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিক" (Third International) প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাকে সংক্ষেপে "কমিন্টার্ণ" (Comintern) বলা হয়। তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিকের শাখা দুনিয়ার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং সাম্যবাদী মতবাদ (মার্কসীয় দর্শন) অনুযায়ী ইহা সমস্ত দেশে বিপ্লবী আন্দোলন ও সংগঠন গড়িয়া তোলে।

মার্কসীয় দর্শনের বিস্তৃতি ও বিকাশ পাই মার্কস্-এর রচিত "পুঁজি" পুস্তকে। ইহা মার্কসীয় দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমস্ত কিছুর সমাবেশ। মার্কসীয় মতবাদ সম্বন্ধে ইহা প্রামাণিক গ্রন্থ।

১৯৪৩ সালে তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিকের কর্ত্তৃপক্ষ (বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি হইতে গৃহীত প্রতিনিধি পরিষদ) এই আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘটি ভাঙ্গিয়া দিবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন দেশে তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিকের শাখা কমিউনিস্ট পার্টিগুলি এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিকের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। দুনিয়ার সর্ব্বত্র শ্রমিক আন্দোলন গড়িয়া তোলা, তাহাকে সুপরিচালিত করা এবং শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিক গঠন করিবার মূল কারণ। বর্ত্তমানে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রধান দেশগুলিতেই শ্রমিকশ্রেণীর শক্তিশালী আন্দোলন এবং পার্টি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এই পার্টিগুলি আত্মনির্ভরশীল শক্তিশালী নেতৃত্বও গড়িয়া তুলিয়াছে। তাই বর্ত্তমানে তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিকের সাংগঠনিক প্রয়োজনীয়তা কম। পক্ষান্তরে,

বর্ত্তমানে তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিকের অস্তিত্ব ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রামে সহায়তা না করিয়া ইহার ক্ষতিই করিবে। কারণ জার্ম্মান ফ্যাসিস্টদের প্রধান প্রচার এই যে সোভিয়েট ইউনিয়ন যুদ্ধে জার্ম্মানীকে পরাজিত করিয়া সারা তুনিয়াব্যাপী সোভিয়েট গড়িয়া তুলিবে এবং এজন্য তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিক সোভিয়েটের অস্ত্র স্বরূপ কাজ করিবে। অনেক সংপ্রকৃতির লোক, সাধারণ গণতন্ত্রী, যাঁহারা ফ্যাসিস্টবাদকে ধ্বংস করিতে চাহেন, অথচ সোভিয়েট সম্পর্কে যাঁহাদের এখনও অনেক সংস্কার রহিয়া গিয়াছে, তাঁহারা ফ্যাসিস্টবাদের এই জালে আট্‌কা পড়িতেছিলেন। তাঁহাদের আশঙ্কা হইতেছিল যে সোভিয়েট সম্ভবতঃ জোর-জবরদস্তি করিয়া তুনিয়ার সকল দেশে সাম্যবাদ কায়েম করিবে। সাম্যবাদ কোন দেশ বা জাতির উপর চাপাইয়া দেওয়া যায় ইহা সোভিয়েট ইউনিয়ান বা কোন সাম্যবাদীই বিশ্বাস করে না। বিভিন্ন দেশের লোকের নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী এবং নিজস্ব শক্তির ভিত্তিতেই ইহা গড়িয়া উঠে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অনেক সংপ্রকৃতির ফ্যাসিস্টবিরোধী দেশপ্রেমিকের মনে তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধে একটা আতঙ্কের ভাব দেখা যায়। এখন তুনিয়ার সকল শ্রেণীর (শ্রমিক শ্রেণীরও বটে) প্রাথমিক স্বার্থ হইতেছে ফ্যাসিস্টবাদকে ধ্বংস করিয়া সর্ব্বত্র জনসাধারণের গণতন্ত্রী রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার জন্য সমস্ত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী খাঁটি দেশপ্রেমিককে সঙ্ঘবদ্ধ করা। কাজেই বর্ত্তমানে তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিককে ভাঙ্গিয়া দিয়া এইরূপ শক্তিশালী জাতীয় গণতন্ত্রী ফ্রণ্ট গঠন করাই হইতেছে শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম কর্ত্তব্য। তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিককে ভাঙ্গিয়া দিবার ফলে শ্রমিকশ্রেণী তুর্ব্বল হয় নাই। ফ্যাসিস্ট শক্তিদের ধ্বংস করিবার জন্য ফ্যাসিস্টবিরোধী সকল শক্তিগুলিকে নিয়োজিত করিতে পারিবার ফলে অন্যান্য সকল দেশপ্রেমিকদের সাথে শ্রমিকশ্রেণীরও স্বার্থ সংরক্ষিত হইতেছে, পৃথিবীতে শ্রমিকশ্রেণী ও তাহার রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়ানের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সর্ব্বত্রই শ্রমিকশ্রেণী সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হইতেছে—তুনিয়ার সকল দেশে শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তদের প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতেছে। যে সকল দেশ কুসংস্কার ও পরাধীনতার অন্ধকারে ডুবিয়া ছিল তাহাদের মধ্যেও

স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়া উঠিতেছে এবং শক্তি সঞ্চিত হইতেছে। তাই তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিককে ভাঙ্গিয়া দিবার ফলে জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমিকশ্রেণী অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছে—আজিকার দিনে তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিককে ভাঙ্গিয়া দিবার ফলেই শ্রমিকশ্রেণী তাহার বিপ্লবী কর্ত্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইতে পারিতেছে।

নিজেদের সারা জীবনের কার্য্যাবলী দ্বারা মার্কস্ ও এঙ্গেল্স্ মার্কস্‌বাদের (সাম্যবাদের) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রকে সাম্যবাদ হইতে বাদ দিলে সাম্যবাদের কোনও অর্থই হয় না। সাম্যবাদ শুধু বই-এর আদর্শই নয়, ইহা একটি জীবন্ত আন্দোলন। মার্কসের কথায় সাম্যবাদ হইল "বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিবার বাস্তব আন্দোলন", আর লেনিন ইহাকে আখ্যা দিয়াছেন "মুক্তি আন্দোলনের সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর দর্শন।" তাই দেখি সাম্যবাদী মার্কস্ ও এঙ্গেল্স্-এর সারা জীবনের ইতিহাস হইতেছে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস। তাঁহারা শ্রমিক আন্দোলনকে বিজ্ঞানসম্মত রূপ দিয়াছেন এবং সেই আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত করিয়াছেন।

মার্কস্‌বাদ কোন কল্পনামূলক দর্শন নয়; ইহা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আদর্শ ও বাস্তব কর্ম্মধারার (Theory and Practice) এমন নিপুণ সমাবেশ মার্কস্‌বাদ ভিন্ন কোন দর্শনেই মিলে না। প্রকৃত আন্দোলনই মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তি। বহু বৎসর ব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনের যে ইতিহাস তিনি পড়িয়াছেন ও দেখিয়াছেন এবং যে আন্দোলনে তিনি নিজে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই তিনি ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যে আদর্শের দিকে শ্রমিকশ্রেণী ধাবিত হইতেছে, তাহাকেই তিনি স্পষ্টরূপ দিয়াছেন। সাম্যবাদে কোনও বানানো কল্পনা নাই। লণ্ডনের পুস্তকাগারে (British Museum) ত্রিশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মার্কস্ বিরাট গ্রন্থ "পুঁজি" রচনা করিয়াছেন। বিশেষ ভাবে ইংলণ্ডের শ্রমিক আন্দোলনই এই পুস্তকের ভিত্তি আর ইংলণ্ডেই শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত। মানুষের ইতিহাসের বিকাশ কি করিয়া হইতেছে তাহা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। রাজনীতি, বিজ্ঞান,

কলা চর্চ্চার পূর্ব্বে—মানুষকে ভাবিতে হয় অশন, বসনের কথা। মানুষ কি করিয়া তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে তাহার উপরেই সমাজের অন্য সমস্ত ব্যবস্থা নির্ভর করে। সমাজের ধনী দরিদ্রের সংঘর্ষের মধ্যদিয়াই ইতিহাস অগ্রগতির পথে চলিয়াছে। সমাজের ভিতর যে ধনী দরিদ্রের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত লাগিয়া থাকে তাহাও মার্কসেরই সিদ্ধান্ত। ইহা ছাড়া ধনীরা কি করিয়া কলকারখানায় মজুরদের শোষণ করে তাহাও তিনি বিস্তারিত ভাবে দেখাইয়াছেন।

মার্কস্ ও এঙ্গেলস্এর পর যাঁহারা সাম্যবাদকে জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং যাঁহারা তাঁহাদের আসাধারণ কর্ম্ম ক্ষমতাদ্বারা এই বিপ্লবী আদর্শকে কার্য্যে রূপান্তরিত করিয়া নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে লেনিন ও স্ট্যালিনের নাম সকলের আগে। এই দুই মহাপুরুষের জীবনী বিপ্লবী কর্ম্মজীবনী। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রুশ দেশে ইঁহাদের জন্ম, আর রুশ বিপ্লব ইঁহাদের কীর্ত্তি। মার্কসের মতো লেনিনও তাঁহার জীবনের বহু সময়ই বিদেশে নির্ব্বাসনে অতিবাহিত করিয়াছেন। তীক্ষ্নবুদ্ধি, কর্ম্মক্ষমতা, নেতৃত্ব-উপযোগী স্বাভাবিক গুণাবলী এবং স্বদেশের উপযুক্ত সহকর্ম্মীদের সহায়তায় তিনি বিদেশ হইতে স্বদেশের আন্দোলন অতি নিপুণ হস্তে পরিচালনা করিয়াছেন। ১৯০৩ সালে তিনি রুশ দেশের সাম্যবাদী দল, বলশেভিক পার্টি গঠন করেন। এই পার্টি গঠনে লেনিন যেমন সাহসিকতা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন তাহার তুলনা বিরল। এই পার্টি গঠনে বহু ভ্রান্ত সহকর্মী ও আন্তরিক বন্ধুদের সহিত লেনিনের বিচ্ছেদ হয়। কিন্তু লেনিন ভালভাবেই বুঝিয়াছিলেন যে বিপ্লবে ভাবপ্রবণতার স্থান নাই; বিপ্লবী আদর্শ ই বিপ্লবীর পক্ষে সকল রকম সম্পর্কের ভিত্তি। শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শ এক এবং এই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার পথও এক, ইহার মধ্যে কোন জোড়াতালি চলিতে পারে না। তাহাতে শ্রমিকের স্বার্থ পূরাপুরি বজায় থাকিতে পারে না। লেনিন সব দিক হইতে বলশেভিক পার্টিকে বিপ্লবে নেতৃত্ব নিবার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলেন। বিপ্লবী কর্ম্মই যাঁহার পেশা, যিনি শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ, পার্টির আদর্শ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিবার

জন্য সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত, পার্টি যাঁহার নিকট প্রাণের চাইতেও প্রিয়, পার্টির সিদ্ধান্ত যাঁহার নিকট অলঙ্ঘনীয়, একমাত্র তিনিই এই পার্টির সভ্য বলিয়া গণ্য হইতেন। শুধু শ্রমিক স্বার্থের প্রতি সহানুভূতি এবং বিপ্লবী আদর্শে (সাম্যবাদে) বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়, সত্যিকারের কাজই বিপ্লবীর সব চাইতে বড় মাপকাঠি। এমন সুশৃঙ্খল ভাবে গঠিত হইয়াছিল বলিয়াই বলশেভিক পার্টি নানারকম বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে রুশদেশের শ্রমিক শ্রেণী গরীব কৃষকদের সহযোগিতায় জার এর ধনিক রাষ্ট্র ধ্বংস করিয়া শ্রমিক-রাজ প্রতিষ্ঠা করে। এই নভেম্বর বিপ্লব দুনিয়ার সর্ব্বত্র নির্য্যাতিত ও শোষিতদের প্রেরণা যোগাইতেছে এবং লেনিন তাহাদের নিকট ত্রাতা-স্বরূপ। ১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারী লেনিন মারা যান। মস্কো নগরীর রেড্ স্কোয়ারে যেখানে লেনিনের মৃতদেহ রক্ষিত আছে সেখানে প্রতিদিন কেবল রুশদেশের জনসাধারণই তাহাদের প্রিয় মৃত নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ সমবেত হয় না, এই মহাপুরুষের সমাধি-ক্ষেত্র দুনিয়ার সকল নিপীড়িতদেরই তীর্থক্ষেত্র।

লেনিনের মৃত্যুর পর উপযুক্ত নেতা স্ট্যালিনের নির্ভুল বিপ্লবী নেতৃত্বে রুশ শ্রমিকগণ আজ ধনিকতন্ত্রকে চিরতরে লুপ্ত করিয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সোভিয়েট দেশে এখন সমুদয় উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক শ্রমিক জনসাধারণ; কলকারখানা, খনি, রেল-ষ্টিমার, জমিজমা প্রভৃতি সমস্ত উৎপাদনের উপায়গুলিই সামাজিক সম্পত্তি। সেখানে অন্যকে শোষণ করিবার কাহারও অধিকার নাই, অন্যের শ্রমের উপর কেহ ভাগ বসাইতে পারে না। সকলকেই উপযুক্ত পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়—তাহা গতর খাটাইয়াই হউক বা বুদ্ধি খাটাইয়াই হউক। সেখানে কাহাকেও বেকার জীবন যাপন করিতে হয় না, সকলেই পরিশ্রম করে এবং পরিশ্রম অনুযায়ী ফল ভোগ করে। সকলকেই পরিশ্রম করিয়া নিজের নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয় বলিয়া এবং শোষক শ্রেণীর উচ্ছেদ হওয়ায় সোভিয়েট দেশে শ্রমজীবিই হইতেছে একমাত্র শ্রেণী। শ্রেণী-বিভেদ সেখানে লোপ পাইয়াছে।

চারিদিকে ধনিক রাষ্ট্রগুলি দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া সত্বেও স্ট্যালিন যে রকম পারদর্শিতার সহিত সকল বাধা অতিক্রম করিয়া, শত্রুদের সকল প্রকার হীন প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ানকে ক্রমশঃই উন্নতির পথে নিয়া আসিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। স্ট্যালিনের নেতৃত্বে চাষী মজুরের দেশ সোভিয়েটের প্রভাব চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে, সোভিয়েট ইউনিয়ান দুনিয়ার নির্য্যাতিতদের নিকট ভরসা স্বরূপ, আর দুনিয়ার শোষকদের নিকট ইহা হইল এক মহা আতঙ্ক।

মার্কস্, এঙ্গেলস্, লেনিন, স্ট্যালিন—ইঁহাদের কাহারও ঠিক শ্রমিক শ্রেণীতে জন্ম নয়। ইঁহারা ধনিক বা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। কিন্তু ইঁহারা সমাজের বিকাশভঙ্গী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের সাথে নিজেদের স্বার্থ মিলাইয়া শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী আদর্শ গ্রহণ করেন। লেনিন শ্রমিক কৃষকদের সঙ্গে এতটা মিশিয়া গিয়াছিলেন যে অতি সহজেই তাহাদের মনের কথা উপলব্ধি করিতে পারিতেন। রুশ শ্রমিক-চাষীর স্বভাবই হইয়া পড়িয়াছিল লেনিনের স্বভাব। প্রকৃতপক্ষে, দুনিয়াতে যদি অন্যায় অবিচার বন্ধ করিতে হয়, যদি সকলের জন্য প্রকৃত স্বাধীনতা, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, দুনিয়াকে যদি ধ্বংসের কবল হইতে উদ্ধার করিতে হয়, তাহা হইলে শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শ সমাজতন্ত্রবাদ-সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করা ভিন্ন অন্য কোনও পথ নাই। মার্কস্, এঙ্গেল্স্, লেনিন ও স্ট্যালিন শুধু শ্রমিক শ্রেণীরই আদর্শ-স্থানীয় নন, তাঁহারা দুনিয়ার সকল রকম শ্রমজীবিদের আদর্শ স্থানীয়।

প্রশ্নমালা

১। মার্ক্স্, এঙ্গেলস্, লেনিন ও স্ট্যালিনের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা কি ?

২। লেনিনের বিধান অনুযায়ী কি রকম লোক বলশেভিক পার্টির সভ্য হইবার উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইত ?

দুই

আমরা যদি আমাদের আশে পাশে একটু লক্ষ্য করি, তাহা হইলে বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, এই সমাজ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত—ধনী ও দরিদ্র। সমাজের একদিকে শোষিত ও নির্য্যাতিত জনসাধারণ। তাহারা দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়াও উপযুক্ত খাঁওয়া পরার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না বা পরিশ্রম করিবার মত স্থান ও ক্ষেত্রের অভাবে দুঃসহ বেকার জীবন যাপন করিতেছে এবং অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে অসহ্য লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণার মধ্যে মৃত্যুকেও শ্রেয়ঃ মনে করিতেছে—দুনিয়ার শ্রমজীবি সর্ব্বহারাগণ। আর, অন্য দিকে সমস্ত কিছু সুখ সম্ভোগের মালিক, যাহাদের পরম সুখে দিনাতিপাত করিবার জন্য বিন্দুমাত্রও পরিশ্রম করিতে হয় না, সেই পরশ্রম-ভোগী ধনী ও বিত্তশালী দল। এতদ্ভিন্ন সমাজে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই একটি শ্রেণী দেখা যায়, কিন্তু মোটামুটি ভাবে সকলকেই উপরোক্ত দুইটি শ্রেণীর মধ্যে ভাগ করা চলে। একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়ান ভিন্ন দুনিয়ার সর্ব্বত্রই যে সমাজ ব্যবস্থা চলিতেছে, তাহাতে একদল লোককে—শ্রমজীবিদিগকে কলকারখানা, জমিজমা প্রভৃতি উৎপাদন-ক্ষেত্রগুলিতে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিতে হইতেছে, কিন্তু তাহাদের এই খাটুনির বা পরিশ্রমের পূর্ণ ফল তাহারা ভোগ করিতে পায় না। কেননা এই উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক তাহারা নয়, উৎপাদনের উপায়ের উপর তাহাদের মালিকানা স্বত্ব হারাইয়া ফেলিয়া তাহারা সর্ব্বহারায় পরিণত হইয়াছে। একমাত্র পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা ছাড়া তাহাদের আর কোন উপায় নাই। উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক ধনিক বা বিত্তশালী সম্প্রদায়গুলি শ্রমজীবি

সর্ব্বহারাদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করে; জমিদার চাষীর পরিশ্রমের ফল ভোগ করে, জমির উপর তাহার মালিকানা স্বত্বের জোরে। কলওয়ালা শ্রমিকের শ্রম ভোগ করে কল কারখানার উপর তাহার মালিকানা স্বত্বের জোরে। সমাজের ধনী দরিদ্র সকলের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা উৎপাদন করিতে হইলে যে সকল উৎপাদনশক্তি—যেমন জমি, খনি, কলকারখানা প্রভৃতি প্রয়োজন, তাহার সব কিছুরই মালিকানা-স্বত্ব মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনীর; কাজেই সমাজের সকলে ইহার ফল ভোগ করিতে পায় না।

সমাজে এই শ্রেণী বিভাগ, ধনী-দরিদ্র, শোষক-শোষিত, শ্রমিক-পরশ্রমভোগী, ইহা অতি আদিম যুগ হইতেই দেখা যায়। অবশ্য সব সময় ইহার রূপ এক রকম ছিল না। সমাজ বিকাশের এক এক স্তরে, উৎপাদন ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির এক এক যুগে ইহা এক এক রূপ নিয়াছে। মানব সমাজের একেবারে স্বরুতে সমাজ ছিল শ্রেণী-হীন, তখন কোন শ্রেণী বিভেদ ছিল না। সেই যুগে উৎপাদন-শক্তিগুলি ছিল অতি অনুন্নত, সাধারণ তীর-বল্লম সকলেই তৈয়ার করিতে পারিত আর মানুষ দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উৎপাদন করিত অর্থাৎ শিকার করিত তাহা তাহার নিজের উদর-পূর্ত্তি করিবার পক্ষেও সব সময় যথেষ্ট হইত না। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে একজনার জন্য যে পরিমাণ খাওয়া পরার সংস্থান করা প্রয়োজন, একজন লোক মাত্র সেই পরিমাণ দ্রব্যাদিই উৎপাদন করিতে সক্ষম, উদ্বৃত্ত কিছুই বাঁচিত না। অধিকন্তু উৎপাদনের উপায়গুলি অতি সরল ছিল বলিয়া উহা সকলেই যোগাড় করিতে পারিত, উহা কাহারও ব্যক্তিগত একচেটিয়া সম্পত্তিতে পরিণত করা সম্ভবপর হয় নাই। স্বাভাবিক প্রয়োজনে মানুষ তখন দলবদ্ধভাবে সামাজিক জীবন যাপন করিত। একা একা কাহারও পক্ষে বন্য জন্তু শিকার করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করা সম্ভবপর হইত না। সকলে মিলিয়াই সব কিছু তৈয়ার করিত এবং সকলে একত্রে তাহা ভোগ করিত। ব্যক্তিগত নিজস্ব সম্পত্তি নামে কাহারও কোন উৎপাদনের উপায় ছিল না, সকল সম্পত্তি ছিল সামাজিক-সম্পত্তি—সমাজের সকলের। কিন্তু যখন উৎপাদনের উপায়গুলির এমন একটু উন্নতি হইল যে একের পরিশ্রমে একা-

ধিক লোকের ভরণপোষণের ব্যবস্থা হওয়া সম্ভবপর, (কৃষিকার্য্য) তখন হইতেই শ্রেণী বিভেদের সৃষ্টি হইল। "জোর যার মুল্লুক তার" নীতি অনুযায়ী কিছু লোক ক্রমে সমাজের সমুদয় উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক হইয়া বসিল। আদিম সাম্যবাদী যুগের পর শ্রেণী সমাজের প্রথমে আসিল দাস-প্রথা, তাহার পর উৎপাদনের উপায়ের ক্রমোন্নতি ও সমাজ বিকাশের সাথে সাথে ক্রমে আসিল সামন্ততান্ত্রিক যুগ ও ভূমিদাস-প্রথা। আজিকার ধনিক ব্যবস্থায় আমরা দেখিতে পাই মজুরী-প্রথা (wage labour)।

দাস-প্রথা শোষণের প্রথম রূপ। এই যুগে দাসরা ছিল মালিকদের নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ঠিক বাড়ীঘর, জমিজমা, গরু-বাছুর প্রভৃতির মতই প্রভুর সম্পত্তি। প্রভুর জন্য দাস কাজ করিত এবং তাহার ভরণপোষণ করিবার দায়িত্ব ছিল প্রভুর। তাহার ভালমন্দ এমন কি জীবন-মরণ পর্য্যন্ত নির্ভর করিত প্রভুর প্রয়োজন বা ইচ্ছার উপর।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজে মুষ্টিমেয় অভিজাত জমিদার হইল সমস্ত জমিজমার মালিক, জমির উপর সমস্ত রকম অধিকার ও ক্ষমতা হইল তাহাদের। চাষীরা ভূমি-দাস হিসাবে এই জমি-জমায় চাষ বাস করিত। ভূমি-দাস অভিজাতের জমিজমায় চাষবাস করিত বলিয়া তাহার ভরণপোষণের জন্য অভিজাত তাহাকে সামান্য কিছু জমি দিত। এইভাবে ভূমি-দাসের পরিশ্রমে উৎপন্ন ফসলের বৃহৎ অংশই অভিজাতরা ভোগ করিত। আর, সামান্য এক টুকরা জমির উপর ভোগ-স্বত্ব লাভ করা ও বজায় রাখিবার জন্য ভূমি-দাসদিগকে অভিজাতদের অনেক অন্যায় আব্দার রক্ষা করিতে হইত ও অনেক রকম সেবা পরিচর্য্যা করিতে হইত। পূর্ব্বযুগের দাসদের সাথে ভূমিদাসদের বড় বেশী প্রভেদ ছিল না। তাহাদের মোটেই স্বাধীনতা ছিল না, জমিদারের খুশী ও খামখেয়ালই ছিল তাহাদের নিকট আইন। শোষণের মাত্রা কম বেশী হইত জমিদারের প্রয়োজন অনুযায়ী। আমাদের দেশে সামন্ততান্ত্রিক যুগের অনেক লক্ষণই এখন পর্য্যন্ত বজায় আছে (যেমন, বেগার প্রথা, নান্‌কার প্রথা প্রভৃতি)। যদিও এখন ধনিক প্রথারই প্রাধান্য, তবু সামন্তরাজ্যগুলি (Native

States) ও জমিদারী প্রথা আমাদিগকে সামন্ততান্ত্রিক সামাজের অনেকটা আভাস দেয়।

ধনিক সমাজে (বুর্জ্জোয়া বা ক্যাপিটালিস্ট সমাজে) কলকারখানা, জমিজমা, রেল-স্টিমার, খনি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সমস্ত উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক মুষ্টিমেয় ধনিকগণ। তাহারা মজুরীর পরিবর্ত্তে শ্রমিকদের পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা ক্রয় করে এবং তাহাদের কলকারখানা প্রভৃতিতে ভাড়া করা শ্রমিকদিগকে খাটাইয়া দ্রব্য-সম্ভার উৎপাদন করায়। এই দ্রব্য-সম্ভারের মালিক ধনিক নিজে ; এই দ্রব্য সম্ভার বাজারে পণ্য হিসাবে বিক্রয় করিয়া যে টাকা হয়, তাহা ধনিকের নিজস্ব সম্পত্তি। উৎপাদনকারী শ্রমিকের সঙ্গে দ্রব্যসম্ভার ভোগ করিবার কোনও সম্বন্ধ নাই, তাহার পাওনা শুধু মজুরীটুকুই। আর, যেহেতু শ্রমিকের হাতে কোনও উৎপাদনের উপায় নাই, সেইজন্য সে কোন না কোন ধনিকের উৎপাদনের উপায়গুলি লইয়া অল্প মজুরীতে কাজ করিতে বাধ্য হয় এবং এইভাবে শোষণ কেবল বাড়িয়াই চলে। দাস বা ভূমিদাসের সাথে শ্রমিকের প্রভেদ এই যে, শ্রমিক স্বাধীন অর্থাৎ যেখানে খুশী কাজ করিতে পারে। কিন্তু সে কোনও উৎপাদনের উপায়ের মালিক নয়। তাহাকে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কোন না কোন ধনিকের কাজ করিতেই হইবে এবং ধনিকের দেওয়া মজুরীতে সে কাজ করিতে বাধ্য। মধ্যবিত্তশ্রেণীগুলি ও ক্রমেই উৎপাদনের উপায় হারাইয়া শ্রমিকের দল বৃদ্ধি করিতেছে, আর মজুরীর মাত্রা ততই কমিতেছে। এই শোষণ-প্রথা এখন দাস-প্রথাকেও হার মানাইতেছে। প্রভুকে দাসের খাওয়া-পরার বন্দোবস্ত করিতেই হইত ; দাস রোগে ভুগিলে, তাহার স্বাস্থ্য খারাপ হইলে বা সে মারা গেলে প্রভুর যথেষ্ট ক্ষতি হইত। রীতিমত কাজ চালাইবার জন্য তাহাকে নূতন দাস খরিদ করিতে হইত। কাজেই সচরাচর নিজের গরজেই প্রভুকে তাহার দাসের ভরণপোষণের চলনসই একটা ব্যবস্থা করিতে হইত। কিন্তু ধনিক-সমাজে শ্রমিক কি খায়, কি পরে, সে রোগে ভুগিতেছে, না মারা পড়িল, ধনিকের সেই দিকে নজর দিবার কোনও প্রয়োজনই হয় না। অল্প মজুরীর ফলে যদি কোনও শ্রমিক পশুর মত জীবনের অসহ্য লাঞ্ছনায় অসময়ে

মারাও পড়ে তাহাতে ধনিকের নূতন মজুর যোগাড় করিতে কোনও বেগ পাইতে হয় না বা অতিরিক্ত খরচ করিতে হয় না। মজুরের জীবন মরণ সম্বন্ধে কোনও দায়িত্বই ধনিকের নাই। কাজেই শ্রমিকেরা নামে স্বাধীন হইলেও কার্য্যতঃ তাহাদের কোনও নিশ্চিত জীবিকাই নাই।

শ্রেণী-সমাজ যেমন পুরাতন ব্যাপার, শ্রেণী সংগ্রামও ঠিক তেমনি। যেই-দিন হইতে মানব সমাজে শ্রেণী বিভেদ সৃষ্টি হইয়াছে শ্রেণী সংগ্রামও সেইদিন হইতেই চলিতেছে। সমাজের রূপের বিভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিভিন্ন রূপ নিয়াছে। ইহা কখনও ছিল গোপন, কখনও প্রকাশ্য; কখনও সীমাবদ্ধ, কখনও ব্যপক; কখনও কম, কখনও তীব্র; এবং এই শ্রেণী সংগ্রামের ভিতর দিয়াই সমাজের পরিবর্ত্তন ও বিকাশ হইয়াছে।

কখনও কখনও এই সংগ্রাম বিদ্রোহ ও বিপ্লবের আকার নিয়াছে। ইতিহাসে দাস-বিদ্রোহের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। যদিও এই বিদ্রোহগুলি সফল হয় নাই তবুও চল্‌তি দাস-প্রথাকে মাঝে মাঝে ইহা খুব জোরে আঘাত দিয়াছে এবং তাহারই ফলে এই প্রথা ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়ে। চাষী-বিদ্রোহের প্রমাণ ইতিহাসে ভূরি ভূরি মিলে। জমিদারদের (অভিজাত সম্প্রদায়ের) সঙ্গে চাষীর গৃহ-যুদ্ধ সকল দেশে হামেশাই চলিয়াছে এবং এই চাষী বিদ্রোহের সুযোগ নিয়াই তখনকার মধ্যবিত্ত বণিক সম্প্রদায় (বর্ত্তমান ধনিক শ্রেণী) সামন্ত ও ভূমিদাস-প্রথা উচ্ছেদ করিয়া ধনিক প্রথা কায়েম করে। চল্‌তি দুনিয়ায় শ্রমিক বিদ্রোহ ও বিপ্লবের প্রমাণ খুঁজিতে মোটেই বেগ পাইতে হয় না। ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সর্ব্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রাম বহু জায়গাতেই বিদ্রোহের আকার নিয়াছে এবং অনেক জায়গাতে বিপ্লবে পরিণত হইয়াছে। ১৮৭১ সালে ফরাসী দেশের প্যারী সহরের শ্রমিকেরা বিপ্লবের দ্বারা "প্যারী কমিউন" নামক নিজেদের রাজ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল; কিন্তু তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ফরাসী ও জার্ম্মান ধনিকদের মিলিত শক্তির চাপে কমিউন ধ্বংস হইয়া যায়। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে রুশদের শ্রমিক শ্রেণী বিপ্লব সুরু করে এবং ধনিক শ্রেণীর সাথে গৃহ-যুদ্ধে জয়যুক্ত হইয়া সোভিয়েট

ইউনিয়ান নামক শ্রমিকরাজ কায়েম করে। ১৯৪০ সালে ল্যাটভিয়া, লিথু-য়ানিয়া ও এস্তোনীয়ার শ্রমিকশ্রেণী স্ব স্ব দেশে বিপ্লব জয়যুক্ত করিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ানের সাথে মিলিত হয়।

প্রশ্নমালা

১। মানব সমাজ কয়টি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত? এইগুলি কি কি এবং ইহাদের বিশেষত্ব কি কি?

২। শোষিতগণ শোষকদের অধীনে কাজ করিতে বাধ্য হয় কেন?

৩। এই পর্য্যন্ত কত রকমের সমাজ গিয়াছে? কাহার বিশেষত্ব কি? শোষণ সুরু হইল কখন এবং কেন?

৪। শ্রেণী সংগ্রাম কি? উদাহরণ দাও।

———



তিন

আমরা দেখিয়াছি, মানব সমাজের একেবারে স্থরুতে কোনও শ্রেণী বিভাগ ছিল না। সেইরূপ সেই যুগে কোনও রাষ্ট্রও ছিল না—শ্রেণী বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের উপায়গুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর রাষ্ট্রের উৎপত্তি—শ্রেণী সমাজকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য, উৎপাদনের উপায়-গুলির উপর ব্যক্তিগত অধিকার বজায় রাখিবার জন্য। মানব সমাজে যখন শোষণ স্থরু হইল, কিছু লোক যখন সমাজের উৎপাদনের উপায়গুলিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করিল, তখন এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক শোষক শ্রেণীর প্রয়োজন হইল এমন একটা অস্ত্রের বা যন্ত্রের, যাহা দ্বারা শোষণ প্রথাকে বজায় রাখা চলে। শোষিতগণ শোষণ-প্রথার বিরুদ্ধে গণ্ডগোল করিবে, বিদ্রোহ করিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক, অথচ এইরূপ গণ্ডগোল শোষক শ্রেণীর স্থখের জীবনের পক্ষে কণ্টকস্বরূপ। তাই রাষ্ট্রের উদ্ভব। রাষ্ট্র শাসকশ্রেণীর শাসন-যন্ত্র ; সমাজে যে শ্রেণীর প্রাধান্য, উৎপাদনের উপায়গুলি যে শ্রেণীর হাতে, তাহার হুকুম তামিল করাই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য। শোষক সমাজে ইহার কাজ সমাজের সকলকে শোষক শ্রেণীর স্বার্থ অনুযায়ী চলিতে বাধ্য করা, তাহা সমাজের সাধারণের পক্ষে ভালই হউক কি মন্দই হউক! মুষ্টিমেয় শোষকদের স্বার্থ জনসাধারণের স্বার্থের বিরোধী, স্থতরাং জোর করিয়াই ইহা রক্ষা করিতে হয়। শোষণপ্রথা ধ্বংস করিয়া নির্য্যাতিত শ্রমিকশ্রেণী যখন শাসন ক্ষমতা দখল করিবে, তখন রাষ্ট্রের কাজ হইবে জনগণের স্বার্থ বজায় রাখা এবং সেইজন্য প্রয়োজন বোধে জনস্বার্থ-বিরোধীদের উপর জুলুম প্রয়োগ করা।

মানব সমাজের প্রথমে আদিম সাম্যবাদী যুগে রাষ্ট্রের কোনও প্রয়োজন হয় নাই, কেননা তখন সমাজ ছিল শ্রেণীহীন, শ্রেণীবিভেদ সৃষ্টি না হওয়ায় সকলে মিলিয়া উৎপাদন করিত এবং সকলেই ভোগ করিত, কাহারও উপর জোর-জুলুম চালাইবার প্রশ্ন উঠে নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজে শ্রেণীবিভেদ থাকিবে ততক্ষণ রাষ্ট্রও থাকিবে। কর্তৃত্বশীল শ্রেণীর স্বার্থ ও প্রয়োজন অনুযায়ী সমাজগঠন ও পরিচালনা করিবার জন্য এবং সেইজন্য প্রয়োজন হইলে ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের উপর বলপ্রয়োগ, চল্‌তি কথায় "আইন ও শৃঙ্খলা" বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্র একটি যন্ত্র বিশেষ। মোটকথা, রাষ্ট্র চিরকালই ছিল না, সমাজের এক বিশেষ অবস্থায় ইহার সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই অবস্থা লোপ পাইলে রাষ্ট্রও লোপ পাইবে। আদিম শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্র ছিল না; সমাজে যখন বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হইল, রাষ্ট্র সেই সময়ের সৃষ্টি। আবার ভবিষ্যতে যখন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পূর্ণ প্রতিষ্ঠার ফলে শ্রেণী বৈষম্য দূর হইবে, শ্রেণীবিভেদ লোপ পাইয়া পুনরায় শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, রাষ্ট্র তখন লোপ পাইবে। শুধু দু'একটি দেশে সমাজ-তন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলেও সেই সেই দেশে রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন হইতে পারে না। কারণ, যতক্ষণ শত্রুদেশগুলির (ধনিক রাষ্ট্রগুলির) যথেষ্ট ক্ষমতা রহিয়া যাইবে ততক্ষণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে যথেষ্ট সচেষ্ট ও সতর্ক থাকিতে হইবে। অন্ততঃ প্রধান প্রধান দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে পর রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা বিলুপ্ত হওয়া সম্ভবপর হইবে।

কর্তৃত্বশীল শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য, উৎপাদনের উপায়গুলি যাহাতে শ্রেণী বিশেষের হাতছাড়া না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য রাষ্ট্র অন্য শ্রেণীর উপর বলপ্রয়োগের একটা যন্ত্র বিশেষ—এই বিষয়টি চট্‌ করিয়া বুঝা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, কর্তৃত্বশীল শ্রেণী সাধারণতঃ বিশেষ চেষ্টা করে যাহাতে রাষ্ট্রের প্রকৃতরূপ সাধারণে বুঝিতে না পারে, কেননা, ইহার প্রকৃতরূপ বুঝিতে পারিলে সকল শ্রেণীর লোকের ইহার উপর আস্থা থাকিবে না। এইজন্য শোষক সমাজে শাসকরা তাহাদের রাষ্ট্র সম্বন্ধে

ইহাই প্রচার করিতে করিতে চেষ্টা করে যে রাষ্ট্র "নিরপেক্ষ"। কিন্তু ধনিক সমাজে রাষ্ট্রের প্রকৃতরূপ বুঝা যতটা কঠিন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমাজে সেইরূপ ছিল না। তখন রাষ্ট্রের আবরণ ও শাসনের উপায়গুলি ছিল সহজ, সরল ও প্রকাশ্য। ধনিক সমাজে সেইগুলি অতি নিপুণ ও জটিল। দাস-সমাজে দাসরা সহজেই বুঝিতে পারিত যে আইন-কানুন, বিচার-আচার, সুখ-সুবিধা, সব কিছুরই ব্যবস্থা তাহাদের প্রভুদের জন্য, তাহাদের জন্য নয়। "ঈশ্বরের প্রতিনিধি", "ধর্ম্মাবতার", "নিরপেক্ষ বিচারক"—রাজা সম্বন্ধে এই জাতীয় নানারূপ বিশেষণ প্রয়োগ করায় মধ্যযুগীয় সামন্ত-সমাজে রাষ্ট্রের প্রকৃত রূপ অনেকটা অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু রাষ্ট্রের আইন-কানুন, শাসন-প্রণালী প্রভৃতি গঠনে সাধারণ লোকের কোনও ক্ষমতা না থাকায় এবং এইগুলি সব সময়ই অভিজাতদের সুবিধার্থ ব্যবহৃত হওয়ায় রাষ্ট্রের প্রকৃতরূপ বুঝিতে খুব বেশী বেগ পাইতে হইত না। ধনিক সমাজে গণতন্ত্র (ডেমোক্র্যাসী) জিনিসটা ধনিকদের এক অভিনব সৃষ্টি। গণতন্ত্রে প্রথম প্রথম যদিও ভোট দিয়া শাসক নির্ব্বাচনের অধিকার মাত্র বিত্তশালী লোকদেরই ছিল, তবে বহু আন্দোলনের ফলে বর্ত্তমানে সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্ত্তিত হওয়ায় গণতন্ত্র যে শুধু ধনিকদেরই গণতন্ত্র ইহা বাহ্যতঃ প্রকাশ পায় না! সকলে ভোট দিয়া রাষ্ট্রের পরিচালকগুলী নির্ব্বাচিত করিবার ফলে মনে হয় যেন রাষ্ট্র নিরপেক্ষ, ইহাতে সকলের সমান অধিকার। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব, এই ভোট-প্রথার মধ্যে কত গলদ, কত ফাঁকি আছে। যে সমাজে সমস্ত উৎপাদনের উপায়গুলি মাত্র কয়েকজন ধনিকের হাতে, যেখানে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য শ্রমিক কৃষক প্রভৃতি জনসাধারণকে ধনিকশ্রেণীর অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হয়, যেখানে জনসাধারণের খাওয়া-পরার কোনও নিশ্চিত ব্যবস্থা নাই, এক কথায় যে সমাজে জনগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নাই, সেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিশেষ কোনও অর্থ হয় না। উৎপাদনের উপায়গুলির উপর জনসাধারণের কর্ত্তৃত্ব না থাকায়—তাহারা নিজেদের দরকার মত কাজ করিতে পারে না। ধনিক ভিন্ন অন্যান্য সকলকে ধনিকদের অধীনে তাহাদেরই খুসী মত খাটুনি খাটিতে

হয়। কাজেই ধনিক সমাজে "স্বাধীনতার" অর্থ দাঁড়ায়, "ধনিকদের স্বাধীনতা" এবং "গণতন্ত্রের" অর্থ দাঁড়ায়, "ধনিকদের গণতন্ত্র"। স্বাধীন ইচ্ছায় ভোট দেওয়ার কথা যতই আইনানুগ হউক না কেন, ভোটের ব্যবস্থা যতই গোপন থাকুক না কেন, যে ব্যক্তি খাওয়া-পরার জন্য ধনিকদের অনুগ্রহপ্রার্থী, সে ধনিককে খাতির করিতে বাধ্য, নিজের প্রকৃত স্বার্থে ভোট দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবপর নয়। জনগণ অশিক্ষিত ও অভাবগ্রস্থ বলিয়া ধনিকগণ সহজেই তাহাদিগকে ঠকাইতে বা প্রলুব্ধ করিতে পারে। কথায় বলে অভাবে স্বভাব নষ্ট। টাকা দিয়া ভোট কিনিবার খবর কে না রাখে? অভাবের তাড়নায় উচ্চ শিক্ষিত লোক পর্য্যন্ত সামান্য লোভে দেশের ও নিজের পরিণাম নষ্ট করেন, এমন দৃষ্টান্ত অজস্র মিলে। অধিকন্তু, নির্ব্বাচনে দাঁড়াইতে হইলে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা দরকার, তাহা কি ধনিক ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভবপর? প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য ব্যয় করা তো দূরের কথা, নির্ব্বাচনের জন্য ফিস্ দাখিল করা, ভোটদাতাদের তালিকা কেনা, যাতায়াত খরচ প্রভৃতি অনিবার্য্য ব্যয়গুলি চালাইবার মত অর্থ পর্য্যন্ত শ্রমিক কৃষকদের হাতে নাই। পরিশেষে, পত্রিকা, সিনেমা, রেডিও—প্রচারকার্য্য চালাইবার উপযোগী এই সকল অত্যাবশ্যক যন্ত্র ধনিক ভিন্ন অন্য কাহারও হাতে আছে কি? ব্যয়বহুল প্রচারের ভিতর দিয়া ধনিক শ্রেণীর লোকেরা অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের মনে এমন ভুল ধারণা সৃষ্টি করে, যেন তাহারাই জনসাধারণের প্রকৃত বন্ধু। মোট কথা, জনসাধারণ ভোট দিয়া আপন লোককে নির্ব্বাচিত করিতে পারে না। ধনিক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন লোকের মধ্যে কোনও একজন অপেক্ষাকৃত "ভালমানুষ"কে বাছাই করিতে হয়। ধনিকশ্রেণীর বিভিন্ন দলের লোক ভোটপ্রার্থী হইয়া দাঁড়ায়, তাহাদেরই একজনকে ভোট দিতে হয়। কাজেই, ধনিক-সমাজে গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে ধনিকশ্রেণীর জন্যই গণতন্ত্র, এখানে ধনিকদেরই স্বাধীনতা, অন্যান্য শ্রেণীর নিকট ধনিক গণতন্ত্রের (বুর্জ্জোয়া ডেমোক্র্যাসী) অর্থ ধনিকশ্রেণীর একনায়কত্ব (বুর্জ্জোয়া ডিক্‌টেটরসিপ্)। ধনিকশ্রেণীর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যাহা কিছু ব্যবস্থা হইবে, যাহা কিছু আইন-

কানুন প্রভৃতি হইবে, তাহা সকলই হইবে ধনিক সমাজ ব্যবস্থা বজায় রাখিবার জন্য, ধনিকদের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য। শাসনের বাহ্যিক রূপ যে রকমই হউক না কেন, ধনিক সমাজে রাষ্ট্র ধনিকশ্রেণীর একনায়কত্ব, ধনিকদের হাতে উৎপাদনের যন্ত্রগুলির কর্তৃত্ব বজায় রাখিবার অস্ত্র।

ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রগুলির রূপ বুঝিতে পারিলে আমাদের নিকট রাষ্ট্রের প্রকৃত রূপ বেশ স্পষ্ট হইবে। ধনিক সমাজের প্রথম যুগে শ্রমিক চাষী প্রভৃতি জনসাধারণ অনেক লড়াই লড়িয়া ভোট দিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। ধনিক শ্রেণীর নিজেদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী স্বার্থের সংঘাত থাকায় তাহারা জনসাধারণের কিছু কিছু দাবী ক্রমে মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। এতদিন ধনিকদের গণতন্ত্র জনসাধারণের চক্ষুর ঠুলির মত কাজ করিয়াছে; গণতন্ত্রের আবরণে তাহারা নিজেদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া অনেক দেশের জনসাধারণেরই চক্ষু খুলিয়াছে। তাহারা এখন আপন পর চিনিতে পারে। তাই নানারকম বাধা-বিড়ম্বনা সত্ত্বেও তাহারা অধিক সংখ্যায় আপনার লোক নির্ব্বাচিত করিতে সুরু করিল। গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির (নাগরিক স্বাধীনতা প্রভৃতি) সুযোগ লইয়া তাহারা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ প্রচার করিতে লাগিল এবং সাম্যবাদী দল গঠন করিতে সুরু করিল। তখন ধনিকদের সমস্ত ফাঁকিবাজি ধরা পড়িল। ইটালী ও জার্ম্মানীর শাসক ধনিকশ্রেণী দেখিল যে, অনেকদিনের অভিজ্ঞতার ফলে নির্য্যাতিত শ্রমিকশ্রেণী বেশ চতুর হইয়া উঠিয়াছে এবং গণতান্ত্রিক আইনকানুনগুলির সুবিধা গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্র প্রায় দখল করিতে বসিয়াছে। তখন ধনিক রাষ্ট্র তাহার গণতান্ত্রিক রূপ বদলাইয়া তাহার নগ্নরূপ ফ্যাসিস্ট বা নাৎসী একনায়কত্ব গ্রহণ করিল। সকলেই বুঝিতে পারিল, এইগুলি ধনিকদেরই রাষ্ট্র। ছলে, বলে, কৌশলে, যে ভাবেই হউক না কেন, ধনিকপ্রথাকে বাঁচাইয়া রাখাই এই রাষ্ট্রগুলির মূল কথা। ধনিক গণতন্ত্রের এই আসল প্রকৃতি আরও ভাল করিয়া ধরা পড়িল স্পেন দেশে। ১৯৩৬ সালে সেখানকার জনসাধারণ যখন অধিকাংশের ভোটে তাহাদের আপন লোক নির্ব্বাচিত করিল,

তখন ধনিকরা ভড়কাইয়া গেল। তাড়াতাড়িতে তাহারা কোনও বাহ্যিক অনুষ্ঠানের দিকেও নজর দিবার অবসর পাইল না; দেখিতে কেমন দেখায় না ভাবিয়াই সোজাসুজি গণতন্ত্রী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বসিল এবং তিন বৎসর পর্য্যন্ত জনসাধারণের নির্ব্বাচিত গণতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া সেখানে ধনিকশ্রেণীর ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব কায়েম করিল। কোথায় গেল গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার বুলি আর কোথায় গেল ভোটের অধিকার! মজার ব্যাপার এই যে, গণতান্ত্রিক জনসাধারণের গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে স্পেন দেশের ফ্যাসিস্টদিগকে কেবল হিটলার ও মুসোলিনীই (জার্ম্মানী ও ইটালী) যে সাহায্য করিয়াছিল তাহা নহে; ইংলণ্ড ফ্রান্স, আমেরিকা সমেত দুনিয়ার সমস্ত গণতন্ত্রী (ধনিক) রাজ্যগুলিও নানা অছিলায় প্রকারান্তরে ফ্যাসিস্টদিগকেই সাহায্য করিয়াছে এবং স্পেনীয় গণতন্ত্র ধ্বংস করিতে সহায়তা করিয়াছিল। দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমবর্দ্ধমান চেতনার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ধনিকতন্ত্রগুলিই তাহাদের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি সঙ্কুচিত করিয়া ক্রমেই প্রকাশ্য একনায়কত্বের দিকে ঝুঁকিয়াছে এবং বহু জায়গাতেই ক্রমান্বয়ে ফ্যাসিস্ট বা নাৎসী প্রথা (ধনিক শ্রেণীর একনায়কত্বের প্রকাশ্য রূপ) প্রচলিত হইয়াছে। মোট কথা, ধনিক শ্রেণী ততক্ষণই গণতন্ত্র বজায় রাখিবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা তাহাদের প্রকৃত একনায়কত্বের রূপ গোপন রাখিয়া জনসাধারণকে শোষণ করিতে সহায়তা করিবে। যে মুহূর্ত্তে গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপ ধরা পড়ে, তখনই গণতন্ত্র ধনিকশ্রেণীর পক্ষে বিপজ্জনক এবং তখন ধনিকশ্রেণী প্রকাশ্য ফ্যাসিস্টরূপ গ্রহণ করিতে এতটুকু বিলম্ব বা দ্বিধা করে না। (ধনিক) গণতন্ত্র এবং ফ্যাসিস্ট বা নাৎসী পন্থা ধনিক শাসনের দুইটি রূপ মাত্র। গণতান্ত্রিক রূপ রক্ষা করা অর্থাৎ জনগণকে সার্ব্বজনীন গোপন ভোটাধিকার দেওয়া, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংগঠন, সভা সমিতি করা, বক্তৃতা দেওয়া, পত্রিকা প্রকাশ করা, প্রভৃতি স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকারগুলির সুযোগ দেওয়া যখন ধনিক রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়ায়, তখন ধনিক রাষ্ট্র জনসাধারণের এই অধিকার লুপ্ত করিয়া নূতন রূপ অর্থাৎ ফ্যাসিস্টরূপ গ্রহণ করে। ফ্যাসিস্ট

রাষ্ট্রে জনসাধারণের কোনও প্রকার নাগরিক অধিকারই নাই ; রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের মতামত গ্রহণ করা হয় না, ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের কোনও বিধানের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইবার অধিকার কাহারও নাই, রাষ্ট্রের কার্য্যের সমালোচনা পর্য্যন্ত আইন-বিরুদ্ধ ; প্রত্যেক ব্যক্তি-বিশেষের উপর রাষ্ট্রের পূর্ণ ক্ষমতা, যাহার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা হইবে, সে তাহা মানিতে বাধ্য।

প্রশ্নমালা

১। রাষ্ট্র কাহাকে বলে ? রাষ্ট্র কি সব সময়ই ছিল ? ইহার সৃষ্টি কখন এবং কেন ?

২। রাষ্ট্রের রূপ কি সব সময়েই এক রকম ছিল বা থাকে ?—কারণ দেখাইয়া উত্তর দেও।

৩। "ধনিক গণতন্ত্র" কি ? "ধনিক গণতন্ত্র" বলা হয় কেন ? ধনিকরা কি এইরূপ বলেন ? কারণ দেখাইয়া উত্তর দেও।

৪। ফ্যাসিস্ট বা নাৎসী রাষ্ট্র কাহাকে বলে ? ধনিক গণতন্ত্রের সাথে ইহার প্রভেদ কোথায় ? ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় কখন এবং কেন ?

৫। "যে সমাজে জনগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নাই, সেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিশেষ কোনও অর্থ হয় না"—ব্যাখ্যা কর।

চার

রাষ্ট্র শ্রেণী-বিশেষের হাতে ক্ষমতা বজায় রাখিবার যন্ত্র; ধনিক সমাজে গণতন্ত্র শুধু ধনিকশ্রেণীর গণতন্ত্র, ইহার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহ প্রকৃতপক্ষে ধনিকদের জন্য, অন্য শ্রেণীর নিকট ইহা ধনিকশ্রেণীর গোপন একনায়কত্ব এবং ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থা ধনিকশ্রেণীর শাসনের আর একটি রূপ,—এই সকল বিষয়ে আমরা বিশদ আলোচনা করিয়াছি। এখন শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ধনিকরাষ্ট্রের কাজ যেমন ছলে, বলে, কৌশলে যে-ভাবেই হউক না কেন, ধনিকশ্রেণীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে ও তাহা বজায় রাখে; সেইরূপ সর্ব্বহারা বিপ্লবের পর যখন উৎপাদনের উপায়গুলি শ্রমিকদের হাতে আসিবে এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন রাষ্ট্রের কাজ হইবে শ্রমিকদের ক্ষমতা কায়েম করা ও বজায় রাখা। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার নাম 'সর্ব্বহারার একনায়কত্ব' (Dictatorship of the Proletariat)। ধনিকশ্রেণীর হাত হইতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কাড়িয়া নিবার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে বহু চেষ্টা ও বহুদিন ব্যাপী আন্দোলন করিতে হইবে। ধনিকশ্রেণী আপ্রাণ চেষ্টা করিবে তাহার ক্ষমতা আঁকড়াইয়া থাকিতে; ইহা রক্ষা করিবার জন্য সে রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা সম্পূর্ণ প্রয়োগ করিবে—আইন-কানুন, রীতিনীতি, সিপাহী শান্ত্রী, কামান বন্দুক, জেল-ফাঁসী কোনটারই ক্রুটী হইবে না। কাজেই সর্ব্বহারা-বিপ্লব জয়যুক্ত করিবার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে কঠিন পরীক্ষার ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। সর্ব্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে প্রত্যেক শ্রমজীবীর থাকিবে পূর্ণ অধিকার, পূর্ণ স্বাধীনতা; শ্রমজীবীর নিকট ইহা গণতন্ত্র, আর শ্রমজীবী ভিন্ন অন্য শ্রেণীর নিকট (ধনিক-

শ্রেণীর নিকট) ইহা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব। এই ব্যবস্থায় ধনিকশ্রেণী এমন কোনও ক্ষমতা বা অধিকার পাইবে না, যাহাতে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা হ্রাস পাইতে পারে বা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের কোনও রূপ ক্ষতি হইতে পারে। ক্রমে ধনিকশ্রেণীর ক্ষমতা ও প্রভাব একেবারে লুপ্ত করিয়া শ্রেণী-বৈষম্য দূর করিয়া শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ গড়িয়া তোলাই শ্রমিকশ্রেণীর এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। ধনিক-গণতন্ত্রের সঙ্গে ইহার মস্ত বড প্রভেদ এই যে, ধনিকশ্রেণীর গণতন্ত্র মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের (ধনিকের) পক্ষে গণতন্ত্র, আর অধিকাংশ লোকের পক্ষেই ইহা অন্য শ্রেণীর একনায়কত্ব, কিন্তু সর্ব্বহারার একনায়কত্ব সমাজের অধিকাংশ লোকের পক্ষেই (প্রত্যেক শ্রমজীবীর পক্ষেই) গণতন্ত্র, আর মুষ্টিমেয় ধনিকদের পক্ষে ইহা অন্য শ্রেণীর একনায়কত্ব। ইহা সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণী তাহাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে নিজেদের একনায়কত্বই আখ্যা দেয়, শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে সকলের জন্য গণতন্ত্র বলিয়া বড়াই করে না। ধনিকশ্রেণী সর্বদাই সত্য গোপন রাখিতে চেষ্টা করে; তাহাদের সব সময়ই ভয় যে, তাহাদের প্রকৃত রূপ প্রকাশ পাইলে নির্য্যাতিত শ্রেণীগুলিকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী সত্য গোপন করিতে চাহে না। যতদিন পর্য্যন্ত কোনও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সমাজের সামান্য লোকের পক্ষেও একনায়কত্ব, ততদিন উহাকে সেই শ্রেণীর একনায়কত্ব আখ্যা দিলেই উহার প্রকৃত রূপ প্রকাশ কর হয়। আবার বিপ্লবের পরে শ্রমিকরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গেই ধনিকশ্রেণী বা তাহাদের প্রভাব একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে না। কাজেই শ্রমিকশ্রেণীকে বহুদিন পর্য্যন্ত ধনিকশ্রেণীর অবশিষ্ট অংশের উপর শাসন চালাইতে হইবে। সর্ব্বহারা একনায়কত্বের সুরুতে আমরা দেখি যে, প্রকৃত পক্ষে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীরই ভোট মারফত রাষ্ট্রশাসনের অধিকার রহিয়াছে।

১৮৭১ সালে জার্ম্মান সেনাপতিদের হাতে পরাজিত হইয়া ফ্রান্সের ধনিক শ্রেণী প্যারী সহর ছাড়িয়া পলায়ন করে। জার্ম্মান সৈন্যদের বাধা দিবার জন্য তখন প্যারীর শ্রমিকরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে থাকে। তখনই শ্রমিকশ্রেণী সর্ব্বপ্রথম ধনিকরাষ্ট্র ধ্বংস করিয়া তাহাদের নিজেদের

রাষ্ট্র গঠন করে। এই রাষ্ট্রের নাম হইল "প্যারী কমিউন"। কমিউন ছিল শুধু শ্রমজীবীদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত একটি সঙ্ঘ বিশেষ। কমিউন আইন কানুন তৈয়ার করিত এবং জনসাধারণ যাহাতে ইহা পালন করে, তাহারও যথোচিত ব্যবস্থা করিত। প্রুসীয় সৈন্য কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া তাহারা মাত্র তিনমাস নিজদের রাষ্ট্র বাঁচাইতে পারিয়াছিল। তাহার পরে ধনিকশ্রেণীর বিপ্লববিরোধী পাল্টা আক্রমণে ইহা ভাঙ্গিয়া যায়। ঠিক কমিউনের মতই এক রাষ্ট্র-যন্ত্র ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময় রুশদেশের শ্রমিক, চাষী ও সৈনিকগণ সৃষ্টি করিল। তাহার নাম রুশ ভাষায় "সোভিয়েট" (সঙ্ঘ বা সমিতি)। শ্রমিকশ্রেণী এই বিপ্লবে পরাজিত হওয়ায় সোভিয়েটগুলি ভাঙ্গিয়া গেল। পুনরায় ১৯১৭ সালের বিপ্লবের সময় রাশিয়ার সারাদেশ এই সোভিয়েট প্রতিষ্ঠানে ছাইয়া গেল। এই সোভিয়েটগুলি সমস্ত শ্রমজীবীদের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত। স্থানীয় শাসনকার্য্য স্থানীয় সোভিয়েটই পরিচালনা করে। কতকগুলি স্থানীয় সোভিয়েট একত্রে জিলা সোভিয়েট নির্ব্বাচিত করে, জিলা সোভিয়েটগুলি উপরের সোভিয়েট নির্ব্বাচিত করে এবং এইভাবে সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েট গঠিত হয়। এই সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েট হইতেছে দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা। ইহাই হইল শ্রমিকশ্রেণীর শাসন-যন্ত্রের প্রথম-রূপ। যখন পর্য্যন্ত দেশের মধ্যে ধনিকশ্রেণী ও তাহাদের প্রভাব কিছুটা রহিয়া গিয়াছে, তখন শ্রমিকরাষ্ট্রের রূপ এইরূপই থাকিবে। বাসস্থানের ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সোভিয়েটে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয় না। সোভিয়েট গঠিত হয় ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অনুযায়ী (Trades), কেননা প্রত্যেক শ্রমজীবীই অর্থাৎ কোন না কোন বৃত্তির সাথে সম্পর্কিত এবং বাসস্থানের চাইতে কর্ম্মস্থলই তাহার নিকট বেশী পরিচিত। আর, সমস্ত কর্ম্মস্থলেই যদি সোভিয়েট গঠিত হয়, যেমন ফ্যাক্টরী সোভিয়েট, অফিস সোভিয়েট, জাহাজ সোভিয়েট, সৈন্যবাহিনী সোভিয়েট, যৌথ জোত (Collective farm) সোভিয়েট, প্রভৃতি, তাহা হইলে কোনও শ্রমজীবীই সোভিয়েটের বাহিরে পড়িবে না। এই ভাবে দেশের জনগণ যে যেখানেই থাকুক না কেন, তাহাদের প্রত্যেকের সহিত যোগসূত্র স্থাপিত হয়

এবং তাহারা সমস্ত রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়। অথচ এই ব্যবস্থায় শ্রমজীবী ভিন্ন অন্য কেহই রাষ্ট্র-শাসনে অধিকার পাইতে পারে না।

শ্রমিক রাষ্ট্রের এই সোভিয়েট রূপ চিরদিনই থাকিতে পারে না। সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে, শ্রমজীবী ভিন্ন অন্যান্য লোকের সংখ্যা ততই কমিতে থাকিবে এবং কালক্রমে প্রত্যেক জনসাধারণই হইবে শ্রমজীবী। এইভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা যতই অগ্রসর হইবে এবং পরিণতির দিকে চলিবে, শ্রেণীবিভেদ ততই লোপ পাইবে এবং ক্রমে শ্রেণী-হীন-সমাজের রূপ দেখা দিবে। তখন সোভিয়েট নির্বাচন-ব্যবস্থায় বৃত্তিগত এবং পরোক্ষ নির্ব্বাচনের কোনও প্রয়োজন থাকিবে না। দেশ শুদ্ধ সকলেই যখন শ্রমিক, তখন ভৌগোলিক অবস্থানকে কেন্দ্র করিয়াই নির্বাচন হইতে পারিবে এবং সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ) ও গোপন ভোটদান প্রথা প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে। ইহাই হইবে খাঁটি গণতন্ত্র—যখন দেশের শাসন ব্যবস্থার উপর দেশের প্রত্যেকটি প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর সমান অধিকার থাকিবে এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে তাহারা তাহাদের রাজনৈতিক সমান অধিকারের যথার্থ ব্যবহার করিতে পারিবে। আইনে যাহাই থাকুক না কেন, ধনিক সমাজে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকায় এই রকমের গণতন্ত্র একেবারেই অসম্ভব। এমন কি, সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রথম অবস্থাতেও এইরূপ পূর্ণ গণতন্ত্র সম্ভবপর নয়। কারণ, এই সময়ে বিভিন্ন শ্রেণী রহিয়া যাইবে এবং বিরোধী স্বার্থ-বিশিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতর গণতন্ত্রের কোনও অর্থ হয় না।

১৯৩৬ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ানে "স্ট্যালিন শাসনপ্রণালী" (Stalin Constitution) নামে যে নূতন শাসনপ্রণালী গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বের বৃত্তিগত এবং পরোক্ষ নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তে ভৌগোলিক অবস্থানকে কেন্দ্র করিয়া সাক্ষাৎ ও গোপন নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, সোভিয়েট ইউনিয়ানে সমাজতন্ত্র এখন অনেকটা পরিণত অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। বর্ত্তমানে সেখানে প্রায় সকলেই শ্রমজীবী, মানে সকলকেই পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে আমরা বিশদ আলোচনা করিয়াছি এবং বলিয়াছি যে, রাষ্ট্র কর্তৃত্বশীল শ্রেণী কর্ত্তৃক তাহার ক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য লোকের উপর বল প্রয়োগের যন্ত্র! ইহাতে অনেকের মনেই একটু খট্‌কা লাগিবার কথা। সৈন্য-সামন্ত, আইন-কানুন, জেল, ফাঁসী প্রভৃতি মারফত রাষ্ট্র বল প্রয়োগ করে এই কথা সত্য, কিন্তু রাষ্ট্র কি সর্ব্বসাধারণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কতকগুলি ভাল কাজও করে না? শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গরীবদের জন্য নানা রকম আইন-কানুন (যেমন, অনাথ আশ্রম, ভিক্ষুক আশ্রম, হাঁসপাতাল, শ্রমিকদের সম্বন্ধে নানা রকম নিয়মাবলী প্রভৃতি) এবং আরও অনেক জনহিতকর কার্য্যও তো ধনিক রাষ্ট্র করিয়া থাকে। রাষ্ট্রের এই যে সকল জনহিতকর কার্য্য ইহা মোটেই নিঃস্বার্থ নয়; আর, ইহারও পিছনে শ্রেণী-বিভেদের পার্থক্যই রহিয়া গিয়াছে। রাষ্ট্র যাহা কিছু করে, তাহার সমুদয়ই বিশেষ কোনও শ্রেণীর প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য, কোনও জনহিতকর কার্য্য করিয়া থাকিলে উহার উদ্দেশ্যও ঠিক এই একই ধরনের। ধনিক প্রথায় সমাজের প্রায় সমুদয় ধনসম্পত্তি মুষ্টিমেয় ধনিকের হাতে বিপুল পরিমাণে জমা হয় এবং ইহারই অনিবার্য্য ফল স্বরূপ জনসাধারণ নিঃস্ব হইয়া পড়ে। সেই অবস্থায় সমাজকে যদি চালু রাখিতে হয়, তাহা হইলে কিছু কিছু অর্থ সাধারণের জন্যও বণ্টন করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। জনসাধারণের অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য এবং অভাব-অভিযোগের জন্য ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই দায়ী; কাজেই এই দায়িত্ব এড়াইবার জন্য কিছু কিছু জনহিতকর কাজ করিতেই হয়। নতুবা তো সর্ব্বদাই বিদ্রোহ ঘটিবার সম্ভাবনা, শান্তিতে শোষণ চালান অসম্ভব। ধনিক প্রথায় ধনবৈষম্যের ফলে সমাজে যে সকল গলদ দেখা যায়, ধনিক সমাজ যেন সেইগুলি দূর করিবার জন্য খুবই উদ্‌গ্রীব—এই রকমের একটা ভাব ধনিক রাষ্ট্রকে সব সময়েই দেখাইতে হয় এবং জনসাধারণের কিছুটা আস্থা বজায় রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে যখন কিছুটা কাজ না করিলেই নয়, কেবল তখনই ধনিক রাষ্ট্র এই রকমের সামান্য কিছু কাজ করে। বর্ত্তমানে জনসাধারণ ক্রমশঃই সচেতন হইয়া উঠিতেছে, কাজেই জনহিতকর কার্য্য সম্বন্ধে তাহাদের চাহিদা খুবই বেশী; সে ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার

অন্ততঃ কিছুটাও না মিটাইলে ধনিক রাষ্ট্র অচিরেই ধূলিসাৎ হইয়া পড়িবে। আর, জনশিক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে বলা চলে যে, ধনিক সমাজের নিজের স্বার্থ রক্ষার্থেই বর্ত্তমান যুগে জনসাধারণের মধ্যে কিছু পরিমাণ শিক্ষা বিস্তার করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কেরাণী প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলেও ভাল ভাবে উন্নত ধরণের কলকব্জা চালান, যুদ্ধ বিগ্রহ করা প্রভৃতি ব্যাপারে পর্য্যন্ত শিক্ষিত লোক চাই। তবে, ধনিক রাষ্ট্র সব সময়েই নজর রাখে যেন এমন শিক্ষাই দেওয়া হয়, যাহা কখনও ধনিক প্রথার বিরুদ্ধে না যায় এবং তাহা ধনিক প্রথার পক্ষেই হয়। মোট কথা, ধনিক সমাজ সব সময়েই সজাগ থাকে, যাহাতে যতটুকু জনহিতকর কাজ না করিলেই নয়, ততটুকুই যেন হয়, তাহার চাইতে একটুকুও অতিরিক্ত নয়। নানা অছিলায় জনহিতকর কাজ কর্ম্ম কম করাই ধনিক রাষ্ট্রের চেষ্টা। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমুদায় কাজই জনসাধারণের পক্ষে হিতকর। প্রথম অবস্থাতে যখন কিছু কিছু ধনিক রহিয়াছে, তখন মাত্র তাহাদের পক্ষেই এইগুলি ক্ষতিকর। সামাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যে ব্যক্তিবিশেষ বা ধনিক শ্রেণীর উপর বলপ্রয়োগ করে, তাহাও সর্ব্বসাধারণের হিতসাধনের জন্য। কারণ, জনসাধারণের পক্ষে হিতকর কাজের ভিতর দিয়াই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং শ্রেণী-হীন সাম্যবাদী সমাজ আসিবে। ধনিকরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ধনিক সমাজ বজায় রাখা, শোষণ ব্যবস্থা রক্ষা করা; তাই ইহা মুষ্টিমেয় ধনিকের স্বার্থে জনসাধারণের উপর বলপ্রয়োগ করে এবং যতটুকু না করিলে নয়, ততটুকু জনহিতকর কাজ করে। আর, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, শোষণব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ কায়েম করা। তাই ইহার সমুদয় কাজই শ্রমজীবী জনসাধারণের স্বার্থে এবং এই স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য ইহা মুষ্টিমেয় ধনিকের উপর বলপ্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

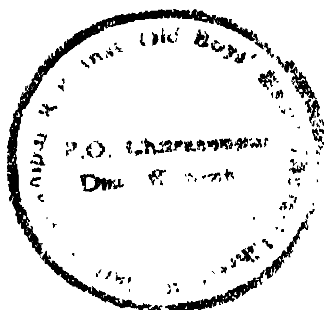
প্রশ্নমালা

১। "সর্ব্বহারার একনায়কত্ব" কি? ইহাকে কি গণতন্ত্র বলা চলে? ধনিক গণতন্ত্রের সঙ্গে ইহার পার্থক্য কি?

২। শ্রমিক-রাষ্ট্র প্রথমে কি রকম রূপ নিবে এবং ইহার ক্রম-পরিণতি কিরূপ ?

৩। "স্ট্যালিন শাসনপ্রণালী" সম্বন্ধে কি জান ?

৪। "রাষ্ট্র কি সর্ব্বসাধারণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কতকগুলি কাজও করে না ?"—বিস্তৃত সমালোচনা কর।



পাঁচ

সমাজে যে শ্রেণীর প্রতিপত্তি, অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষমতা বা উৎপাদনের উপায়গুলি যে শ্রেণীর হাতে, সেই শ্রেণী তাহার অনুকূলে সমাজকে নিজ পছন্দমত গড়িয়া তোলে। সমাজটা হইল কর্তৃত্বশীল শ্রেণীর প্রতিবিম্ব বা ছায়া। নিজের সুবিধা মত সমাজ গড়িবার জন্যই প্রধান শ্রেণীকে রাষ্ট্র দখল করিতে হয় এবং প্রধানতঃ এই রাষ্ট্র-যন্ত্রের সাহায্যেই সে নূতন সমাজ গড়িয়া তোলে। রাষ্ট্র দখল করিবার পর আসে আইন-কানুন, শিক্ষা দীক্ষা, রীতিনীতি, সাহিত্য কলা, সংস্কৃতি, দর্শন-বিজ্ঞান-ধর্ম্ম এবং অন্যান্য সব কিছু। মোট কথা, রাষ্ট্রই এইগুলি গড়িয়া তোলে কর্তৃত্বশীল শ্রেণীর স্বার্থ মত—এইগুলির সব কিছু, এমন কি কোনও কিছু সম্বন্ধে ভালমন্দ জ্ঞান পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় চল্‌তি অর্থনীতি দ্বারা অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়গুলি যাহাদের হাতে তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী। অর্থনীতিই (উৎপাদন-শক্তি এবং উৎপাদন-সম্বন্ধ) হইল মূল কাঠামো যাহার উপর প্রথম গড়িয়া উঠে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রকে ভিত্তি করিয়া ক্রমান্বয়ে আইন-কানুন, রীতিনীতি প্রভৃতি। এইগুলি সবই হইল অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর গড়া বহিরাবরণ—আস্তে আস্তে এইগুলি সৃষ্টি হয় এবং প্রয়োজন মত এইগুলির রদবদল হয়। সমাজে যখন সামন্তদের প্রাধান্য অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষমতা বা উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক যখন সামন্তগণ, তখন রাষ্ট্র, আইন কানুন, রীতিনীতি, শিক্ষা-দীক্ষা, দর্শন-বিজ্ঞান-শাস্ত্র-ধর্ম্ম, সাহিত্য-কলা-সংস্কৃতি সব কিছুই সামন্তসমাজের উপযোগী করিয়া রচিত হইত এবং এই সকলের ভিতর দিয়া সামন্ত প্রথাকেই (সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি) সমর্থন করা হইত। এই

গুলির আপ্রাণ চেষ্টা ছিল সামন্তপ্রথা বজায় রাখা ও বিস্তার করার। তারপর সামন্তপ্রথা ধ্বংস করিয়া ধনিকশ্রেণী যখন অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়গুলির উপর মালিকানা স্বত্ব লাভ করিল, তখন নূতন সৃষ্ট রাষ্ট্র হইতে আরম্ভ করিয়া সেই যুগের দর্শন-বিজ্ঞান-শাস্ত্র-ধর্ম্ম প্রভৃতি সব কিছুই ধনিক প্রথা বা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সমর্থন করিতে লাগিল। এই সকলের ভিতর দিয়া ধনতন্ত্র বজায় রাখিবার ও বিস্তার করিবার সুবিধা অনুযায়ী আদর্শ প্রচার হইতে লাগিল। অর্থনৈতিক ক্ষমতা আবার যখন শ্রমজীবী শ্রেণীর হাতে আসে, তখন এইগুলির কাজ হয় সমাজতন্ত্রকে সমর্থন করা ও সমাজের সর্ব্বত্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিস্তারে সাহায্য করা। বর্ত্তমান যুগে ধনিক দেশগুলি ও সোভিয়েট ইউনিয়ানের দিকে তাকাইলেই এই কথার যথার্থ্যতা প্রমাণিত হইবে। মার্কস্-এর ভাষায়—"সমাজে উৎপাদনের প্রক্রিয়া চালাইয়া যাইতে হইলে মানুষের সঙ্গে মানুষের কতকগুলি সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়; সেগুলি ছাড়া সমাজ জীবন চলেনা, তাহারা ব্যক্তিবিশেষের মর্জির উপর নির্ভর করেনা। ক্রমবিকাশের পথে উৎপাদনের বাস্তব শক্তি যেখানে পৌঁছিয়াছে, উৎপাদনের এই সম্বন্ধ হয় ঠিক তাহারই অনুযায়ী। আবার উৎপাদনের সম্বন্ধগুলি একত্রীভূত করিলেই সমাজের তখনকার আর্থিক গড়ন-টুকু পাওয়া যায়। সেই বাস্তব ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠে সমাজের বাহিরের রাষ্ট্রিক রূপ এবং আইন-কানুন, সামাজিক চেতনার একটা বিশেষ ভঙ্গীও চোখে পড়ে। সুতরাং বাস্তব জীবনে উৎপাদনের রূপটুকুই মোটামুটি ভাবে ঠিক করিয়া দেয় সেই সময়কার সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রিক গড়ন ও চিন্তার ধারা কেমন হইবে। মানুষের চিন্তা হইতে সমাজের বাস্তব জীবন নির্দ্ধারিত হয় না, বরং চিন্তার ধারণাটাই নির্ভর করে সমাজ ব্যবস্থার উপর। এদিকে ক্রমবিকাশের এক একটা বিশেষ অবস্থা আসিয়া পড়িলে, সেই সময়কার উৎপাদনের সম্বন্ধের সঙ্গে সমাজের বাস্তব উৎপাদনী শক্তির সজ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়—এই উৎপাদন সম্বন্ধই অবশ্য সে যুগের সম্পত্তির অধিকার হিসাবে বিরাজ করে। তখন প্রচলিত উৎপাদন-সম্বন্ধ উৎপাদনী শক্তির বিকাশের পথে সহায়

না হইলে শৃঙ্খলে পরিণত হয়। সামাজিক বিপ্লবের যুগ আসিয়া পড়ে এই ভাবেই। সমাজের আর্থিক ভিত্তি বদলাইয়া গেলে, তাহার সমস্ত বাহিরের চেহারাও কম বেশী দ্রুতবেগে রূপ পরিবর্ত্তন করিতে থাকে। সামাজিক পরিবর্ত্তন আলোচনা করিবার সময় সর্ব্বদাই একটা তফাৎ লক্ষ্য করিতে হইবে। উৎপাদনের প্রণালীতে যে-বদল আসে তাহার বাস্তব রূপটুকু বৈজ্ঞানিক মাপ কাঠিতে যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব; কিন্তু আইন-কানুন, রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম্ম, শিল্পকলা, দর্শন ইত্যাদি চিন্তার নানা ক্ষেত্রে যখন মানুষ সমাজ-সঙ্ঘর্ষ সম্বন্ধে সজাগ হইয়া সংগ্রামের মধ্যে সিদ্ধান্তে আসিতে চায়, সেখানে পরিবর্ত্তন ঠিক যান্ত্রিকভাবে হাজির হয় না। কোনও লোক তাহার নিজের সম্বন্ধে যে ধারণা রাখে তাহা দিয়া যেমন আমরা লোকটিকে বিচার করি না, ঠিক তেমনই কোনও পরিবর্ত্তনের যুগের মূল্য বিচার সে-যুগের নিজের সম্বন্ধে ধারণার উপর নির্ভর করে না। বরঞ্চ কোনও যুগের চিন্তাধারার ব্যাখ্যা করিতে হইলে, সে-যুগের বাস্তব জীবনে সঙ্ঘাতগুলির দিকেই নজর দিতে হইবে। অর্থাৎ তখন দেখিতে হইবে কেমন করিয়া তখনকার উৎপাদন সম্বন্ধের সঙ্গে উৎপাদনী শক্তির বিরোধ লাগিতেছে।...মোটামুটি ভাবে এশিয়াটিক সমাজ, প্রাচীন যুগের ব্যবস্থা, মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্র, এবং আধুনিক বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতি এইগুলিকে আমরা সমাজের আর্থিক গড়নের ক্রমবিকাশের পথে ভিন্ন ভিন্ন স্তর হিসাবে ধরিতে পারি" (১৮৬৬ সালের ৭ই জুলাই তারিখে এঙ্গেলস্‌কে লেখা চিঠিতে মার্কস্‌ এবিষয়ে এক কথায় লিখিয়াছিলেন—"আমাদের এই মত যে সমাজের আর্থিক গড়ন নির্ভর করে উৎপাদনের পদ্ধতির উপর।"—অমিত সেনের অনুবাদ)। মোট কথা সমাজে কেহই নিরপেক্ষ হইতে পারে না। সব জিনিসই কোনও না কোনও শ্রেণীর পক্ষে, সাধারণতঃ যে শ্রেণী প্রতিপত্তিশীল তাহারই পক্ষে; বিপ্লবী যুগে ইহার সামান্য ব্যতিক্রম ঘটে, তখন বিরোধী শ্রেণীও তাহার দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্য-কলা প্রভৃতি কিছু কিছু চালু করিতে চেষ্টা করে এবং প্রতিপত্তিশীল শ্রেণীর সঙ্গে ইহা লইয়া জোর বিরোধ চলে, বিপ্লবী শ্রেণীর এই প্রচেষ্টা বন্ধ করিবার জন্য রাষ্ট্রের সমুদয় শক্তি নিয়োজিত হয়। এই জন্যই

সাম্যবাদীরা শ্রেণী-রাষ্ট্র, শ্রেণী-দর্শন, শ্রেণী-বিজ্ঞান, সব কিছুর পূর্ব্বেই "শ্রেণী" বিশেষণটি ব্যবহার করেন। ধনিক বা অন্যান্য শ্রেণী কখনও এইরূপ করে না। তাহার কারণ, সত্যরূপ প্রকাশ করিতে তাহাদের সব সময়েই ভয়, শোষণের রূপটা গোপন ও চাপা থাকাই ভাল। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর সেই ভয় নাই, তাহারা শোষণ বন্ধ করিতে চায়, তাই সত্যের যত প্রচার হয় ততই মঙ্গল।

পৃথিবীতে নিরপেক্ষ ও শাশ্বত জিনিস নাই। এই কথাটা অনেকেরই ভাল লাগিবে না। কিন্তু অতীত ও বর্ত্তমান সমাজের দিকে তাকাইয়া স্থির ভাবে একটু চিন্তা করিলেই তাহারা আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এক সমাজে যাহা আইন, আর এক সমাজে তাহা বে-আইনী; এক সমাজে যাহা নীতি ও ধর্ম্ম, আর এক সমাজে তাহা দুর্নীতি ও অধর্ম্ম; এক সমাজে যাহা প্রশংসনীয়, আর এক সমাজে তাহা খুবই নিন্দার্হ—এমন উদাহরণ যোগাড় করিবার জন্য বিশেষ খোঁজ করিতে হয় না। এক সমাজে যিনি রাজদ্রোহী, সমাজদ্রোহী বলিয়া দণ্ডিত, অন্য সমাজে তিনি যুগাবতার বলিয়া পূজ্য; ফ্রান্সে সামন্ততান্ত্রিক যুগে রাজদ্রোহী বলিয়া গণ্য দার্শনিক রুশোর বিপ্লবী চিন্তাধারাই হইল পরের ধনিক শ্রেণীর মূলমন্ত্র; সামন্ততান্ত্রিক যুগে ইউরোপে লুথার বা ক্যালভিন্ ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া নিগৃহীত হন আর ধনিক সমাজে তাঁহারাই ধর্ম্মগুরু। রাম রাজত্বে শাস্ত্রালোচনা করিবার অপরাধে শূদ্র শম্বুককে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে, অথচ বর্ত্তমান আদর্শ অনুযায়ী আমরা মনে করি শাস্ত্রালোচনায় সকলেরই অধিকার থাকা উচিত। বিবাহ রাত্রিতে ইউরোপে কনেকে ধর্ম্মগুরুর সহিত সহবাস করিতে হইত; সামন্ত-যুগে এই প্রথা অনেক জায়গাতেই ছিল, অথচ আমাদের নিকট ইহা বীভৎস বলিয়া মনে হয়। সামন্ত যুগে যে নারীর গড়নে বহু সন্তান হইবার লক্ষণ দেখা যাইত সে-ই ছিল সুলক্ষণা, লক্ষ্মী-শ্রী; যে ছেলে হইত নিরীহ তাহাকে সকলে পছন্দ করিত; কিন্তু বর্ত্তমান যুগে সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি বদলাইয়া গিয়াছে, এমন সব উদাহরণ যত খুসী উল্লেখ করা যাইতে পারে। তবে কতকগুলি নীতিবাক্য (যেমন, পরধনে লোভ করা অন্যায়, প্রভৃতি), কতকগুলি ধারণা

(যেমন, অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে বিশ্বাস, প্রভৃতি) পূর্ব্বেকার সমাজগুলিতে যেমন ছিল তেমনি আছে। ইহার কারণ এই যে, আদিম সাম্যবাদী সমাজের পরে এই পর্য্যন্ত যত সমাজব্যবস্থা গিয়াছে, সর্ব্বত্রই শোষণ-প্রথা বিদ্যমান। শোষণের রীতি লইয়া প্রভেদ থাকিলেও উপরোক্ত সমস্ত সমাজে সমান ভাবেই শোষণ ব্যবস্থা প্রচলিত। সমাজতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে পূর্ব্বেকার সমাজগুলির মূল প্রভেদ এই যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে শোষণের মূল উপড়ান হইয়াছে, তাই ইহার রীতিনীতির সঙ্গে পূর্ব্বেকার সমাজগুলির রীতিনীতির কোনরকম ঐক্যই নাই।

উৎপাদনের উপায় বা শক্তিগুলির ক্রমোন্নতি সমাজের পরিবর্ত্তন ও ক্রমবিকাশের জন্য দায়ী। উৎপাদন-শক্তিগুলি যখন একেবারে অনুন্নত ছিল, সমাজও ছিল তখন আদিম অনুন্নত স্তরে। আদিম সাম্যবাদী সমাজ সেই যুগেরই কথা। ক্রমে উৎপাদনের শক্তিগুলির উন্নতি হইতে লাগিল এবং সমাজও উন্নতির পথে চলিল। উৎপাদনের শক্তিগুলি সমাজের যে শ্রেণীর করায়ত্ব হইল, সেই শ্রেণীরই হইল প্রাধান্য, তাহাদেরই রাষ্ট্র ও সমাজ। এই-ভাবে সমাজে ক্রমান্বয়ে আসিল দাস-যুগ, সামন্ত-যুগ ও ধনিক-যুগ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও শ্রেণী উৎপাদনের শক্তিগুলির উন্নতির সহায়ক থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্তই রাষ্ট্র-ক্ষমতা তাহার হাতে থাকে। কিন্তু যখন শ্রেণী-বিশেষ উৎপাদনের শক্তিগুলির উন্নতির সহায়ক না হইয়া উন্নতির পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়, তখনই সুরু হয় উৎপাদনের শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের (অর্থনৈতিক ব্যবস্থার) মধ্যে সংঘর্ষ। যে শ্রেণী বিপ্লবী অর্থাৎ যে শ্রেণী আমূল পরিবর্ত্তন বা বিপ্লব কিংবা উৎপাদনের শক্তিগুলির উন্নতি চায়, বিপ্লবী সংগ্রামের ভিতর দিয়া সেই শ্রেণী ক্রমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে নেয়। যতদিন এই বিপ্লবী শ্রেণী উৎপাদনের শক্তির ক্রমোন্নতিতে, সমাজের ক্রমবিকাশশীল পরিবর্ত্তনে সহায়তা করে ততদিনই ইহা বিপ্লবী। পরে নানা নূতন আবিষ্কার হওয়ায় আগের উৎপাদন ব্যবস্থা অকেজো হইয়া পড়ে। তখন এ শ্রেণী সেই নূতন উৎপাদনের শক্তির উন্নতিতে, সমাজের ক্রম-পরিবর্ত্তনে সহায়তা করে না। উন্নতি ও ক্রম-পরিবর্ত্তনের বিপক্ষে

দাঁড়ানই হয় তখন ইহার স্বভাব। তখন যে শ্রেণীর স্বার্থ উৎপাদনের উপায়গুলিকে আরও উন্নতির পথে অগ্রসর করা তাহার সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে সেই নূতন বিপ্লবী শ্রেণীর। অতীতে প্রত্যেক ক্ষমতাশীল শ্রেণীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই আমরা এই কথা ভালভাবে বুঝিতে পারিব। সামন্তরা যখন সমাজের উন্নতির পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইল, ধনোৎপাদন-শক্তির উন্নতির বিপক্ষ হইল, শিল্প-প্রসারের পথে বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল, তখন বিপ্লবী ধনিকশ্রেণী সামন্ত-তন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া ধনিকশ্রেণীর অর্থনীতি ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিল। এতদিন পর্য্যন্ত ধনতন্ত্র ছিল সমাজের বিকাশের সহায়ক। ধনতন্ত্রী সমাজের গোড়ায় ক্রমাগতই উৎপাদন-শক্তিগুলির উন্নতি হইয়াছিল। আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া বিরাট হইতে বিরাটতর কারখানা খোলা হইতেছে। হাজার হাজার মাইল জুড়িয়া আমেরিকার মত কলে চাষবাস হইতেছে। সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া ব্যবসা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সবই হইতেছে বিরাট ভাবে। বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কৃত হইয়া এ পরিবর্ত্তন আরও সহজ সাধ্য করিয়াছে। এতবড় ও সুদূরগ্রাসী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে শুধু মাত্র ব্যক্তিগত লাভের জন্যে চালন সম্ভব নয়। ইহার জন্যে প্রয়োজন সমাজের সকলের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দেওয়া। সমাজতন্ত্রবাদে সমাজের বেশীর ভাগ লোকের স্বার্থ দেখা হয় বলিয়াই একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজ আজ বিপ্লবী নেতার স্থান গ্রহন করিতে পারে। বর্ত্তমান যুগে ধনতন্ত্র সমাজের উন্নতির বিপক্ষে। ইহা প্রতিক্রিয়াশীল, ইহা আর ধনোৎপাদনের শক্তিগুলির উন্নতি চাহে না, চাহিতে পারে না, ইহা এখন বিপ্লব-বিরোধী। তাই আজ বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী ধনতন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া সর্ব্বহারার অর্থনীতি—সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল ধনিক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতেছে এবং সোভিয়েট ইউনিয়ানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধনোৎপাদনের শক্তিগুলির উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিতেছে।

প্রশ্নমালা

১। "সমাজটা কর্ত্তৃত্বশীল শ্রেণীর প্রতিবিম্ব। অর্থনীতি হইল মূল কাঠামো, যাহার উপর গড়িয়া উঠে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রকে ভিত্তি করিয়া ক্রমান্বয়ে আইন-

কাহুন, শিক্ষা-দীক্ষা, দর্শন-বিজ্ঞান-শাস্ত্র-ধর্ম্ম, সাহিত্য-কলা-সংস্কৃতি প্রভৃতি সব কিছু।"—বিশদভাবে বুঝাইয়া বল।

২। "ছুনিয়াতে নিরপেক্ষ ও শাশ্বত নামে কোনও জিনিষ নাই"—এই কথাটা কি ঠিক? বুঝাইয়া বল।

৩। "উৎপাদনের উপায় বা শক্তিগুলির ক্রমোন্নতি সমাজের পরিবর্ত্তন ও ক্রমবিকাশের জন্য দায়ী"—বিস্তৃত সমালেচনা কর।

৪। বিপ্লব কি? বিপ্লবী শ্রেণী কাহাকে বলে? ধনিক (বুর্জ্জোয়া) শ্রেণী কি এখন বিপ্লবী? কখনও কি বিপ্লবী ছিল?

ছয়

ধনিক সমাজে উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণী। এই শ্রেণী ধনোৎপাদনের শক্তিগুলিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করিয়াছে উৎপাদনের উপায়বিহীন সর্ব্বহারা শ্রমজীবীগণ ধনিকদের নিকট তাহাদের শ্রমশক্তি (পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা) মজুরীর বিনিময়ে বিক্রয় করে। ঠিক যতটা পাইলে শ্রমজীবীর পরিশ্রম-জনিত ক্ষতির পূরণ হইতে পারে শ্রমশক্তি ততটা দামেই বিক্রয় হয়। অর্থাৎ শ্রমজীবী যাহাতে পুনরায় বিক্রয় করিবার মত শ্রমশক্তি সংগ্রহ করিতে পারে, ততটুকুই হয় তাহার মজুরী বা শ্রমশক্তির দাম। কোনও রকমে বাঁচিয়া থাকিয়া কাজ করিবার জন্যে তাহার যে অর্থের প্রয়োজন তাহাই মালিক মজুরী হিসাবে দেয়। এই মজুরীর ভিতর শ্রমজীবীর জীবন ধারণের নিরিখ (standard) ও তদনুযায়ী তাহার পারিবারিক প্রয়োজনীয়তাও ধরা হয়। সমাজে সব সময়েই বেকার মজুরের একটি দল থাকে। সেজন্যে শ্রমজীবীদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগীতার ফলে মজুরী কেবলই কমে এবং ক্রমাগত এইভাবে কমিতে কমিতে ইহা অনেক সময় জীবনধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় নিরিখেরও (subsistence level) নিম্নে পড়িয়া যায়। ধনিক তাহার ধনোৎপাদনের উপায়গুলিতে শ্রমজীবীর শ্রম নিয়োগ করিয়া ধনোৎপাদন করায়। শ্রমজীবী দৈনিক পরিশ্রম করিয়া যে ধনোৎপাদন করে, তাহা তাহার মূল্য দৈনিক মজুরীর তুলনায় অনেক বেশী। অর্থাৎ শ্রমশক্তির মূল্যের চাইতে শ্রমের ফলে উৎপন্ন জিনিষের মূল্য হয় অনেক বেশী। এই অতিরিক্ত অর্থ (শ্রমের মূল্য এবং শ্রমশক্তির মূল্য বা মজুরীর মধ্যে যে ব্যবধান)

উৎপাদনের উপায়ের মালিক ধনিকের হাতে জমা হয়। ইহাই তাহার লাভ বা মুনাফা। এইভাবে ধনিকরা অধিকতর ধনী হইতে থাকে, কিন্তু শ্রমজীবীর অবস্থা ভালর দিকে কোনো পরিবর্ত্তন হয় না। উৎপাদিত দ্রব্যসম্ভার ধনিককে বাজারে বিক্রয় করিতে হয়; তাই ধনিকদের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগীতা রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং, সমস্ত ধনিকেরই আপ্রাণ চেষ্টা কে কত কম খরচে বেশী দ্রব্যসম্ভার উৎপাদন করাইতে পারে। এইজন্য মজুরের মজুরী ক্রমেই কমে, খাটুনি ক্রমেই বাড়ে এবং যাহাতে কম মজুর নিয়োগ করিয়া বেশী পণ্য (বিক্রয় করিবার জন্য উৎপাদিত দ্রব্যসম্ভার) তৈয়ারী করান চলে, তাহার জন্য উৎপাদন-শক্তিগুলির (যন্ত্র, কলকারখানা প্রভৃতি) উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন হয়। এইজন্যই ধনিক সমাজে বিজ্ঞানের এক অভূতপূর্ব্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছে; উৎপাদনের উপায়গুলির এত উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে, মানুষের উৎপাদন-ক্ষমতা পূর্ব্বের তুলনায় সহস্রগুণ বাড়িয়া গিয়াছে এবং অল্প লোকের পরিশ্রমে এত বিপুল পরিমাণে দ্রব্য সম্ভার তৈয়ারী হইতেছে যে, পূর্ব্বেকার যুগে তাহা কল্পনারও অতীত ছিল। কিন্তু ধনিক সমাজে যন্ত্র হইয়াছে দানব-তুল্য; যে মানুষ উহার সৃষ্টি ও উন্নতি সাধন করিয়াছে, সেই মানুষেরই ইহার উপর যেন কোনও ক্ষমতা নাই; যন্ত্রদানব মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতেছে না, মানুষই হইয়াছে যন্ত্রদানবের দাস। যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে মানুষের খাটুনি না কমিয়া বরং ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছে এবং অনেক শ্রমিক হইয়া পড়িতেছে বেকার। এইজন্য অনেকে যন্ত্রশিল্পের বিরোধী। তাহাদের ধারণা যন্ত্রশিল্প আসার ফলেই পৃথিবীতে অত্যাচার, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি বাড়িয়াছে, অভাবের তাড়নায় লোকে জীবন দিতেছে; যন্ত্রশিল্প আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে মানুষকে বেকার জীবন যাপন করিতে হয় নাই; সুখ সম্ভোগের দ্রব্যসামগ্রী হয়ত তখন অনেক কম ছিল, মানুষের জীবন ধারণের নিরিখ হয়ত অনেক অনুন্নত ছিল। কিন্তু মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের কাহারও অভাব ছিল না; ধনী দরিদ্রে এতবড় বৈষম্য ছিল না। এই সকলের জন্য তাঁহারা যন্ত্রশিল্পকে দায়ী করেন এবং যন্ত্রকে যন্ত্রদানব আখ্যা দিয়াছেন। বাহ্যতঃ এইরূপ মনে

হইলেও, বাস্তবিক পক্ষে যন্ত্রের কোনও দোষ নাই, দোষ সমাজ-ব্যবস্থার। কারণ সমাজ-ব্যবস্থাই ইহাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করিয়াছে। সকলের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইলে, সমাজের সকলের অধীন থাকিলে যে যন্ত্র মানুষের সমস্ত দুঃখকষ্ট লাঘব করিয়া, পরিশ্রম লাঘব করিয়া, মানুষের জীবনকে অনেক উন্নত, অনেক মহৎ করিতে পারে, তাহা মুষ্টিমেয় ধনিকের মুনাফা তৈয়ার করিতে ব্যবহৃত হওয়ায় শোষিত মানুষের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। সমাজের এই দুরবস্থার জন্য যন্ত্র দায়ী নয়, দায়ী সমাজ-ব্যবস্থা, দায়ী ধনিক সমাজ, যেখানে সমুদয় উৎপাদনের উদ্দেশ্য মুষ্টিমেয় ধনিকের জন্য মুনাফা সৃষ্টি করা, জনসাধারণের অভাব অভিযোগ মিটান নয়। তাই দরকার যন্ত্রশিল্পের ধ্বংস সাধন নয়, যন্ত্রশিল্পের মালিকানা স্বত্ব পরিবর্ত্তন করিয়া উৎপাদনের শক্তিগুলিকে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে আনিয়া সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনে উহার ক্রমোন্নতি সাধন ও মানুষের সমস্ত অভাব অভিযোগ দূর করা। ধনিক সমাজে উৎপন্ন দ্রব্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের অভাব দূরীভূত না হইয়া বাড়িতেছে। সমস্ত ধনসম্পত্তি মুষ্টিমেয় ধনিকের হাতে জমা হওয়াতে সাধারণ লোক নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে, তাহাদের ভোগ করিবার মত আর্থিক ক্ষমতা নাই, অভাব মিটাইতে হইলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহা তাহাদের হাতে নাই। সমাজের একদিকে দেখি ভোগ-বিলাসের সামগ্রীর বিপুল সমাবেশ, অন্যদিকে অধিকাংশ লোক অর্দ্ধাহারে, অনাহারে মরণোন্মুখ, রোগ-শোক-ক্লিষ্ট, সহায়-সম্বলহীন। ইহা যেন গল্পের মত মনে হয়—সমৃদ্ধির মধ্যে অভাব, চতুর্দ্দিকে ভোগ-বিলাসের সামগ্রী সুসজ্জিত, কিন্তু কোনটা স্পর্শ করিবার শক্তি জনসাধারণের নাই। লোক খাওয়ার অভাবে মরে অথচ বাজারে জিনিষ প্রচুর; সাধারণ লোক প্রায় অর্দ্ধনগ্ন অথচ কাপড়ের অভাব নাই; রোগে লোকের চিকিৎসা হয় না, অথচ ডাক্তাররাও বেকার; ইঞ্জিনিয়ারের কাজ নাই তবু কত লোক গাছতলায় দিন কাটায়, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে কত লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়; শিক্ষক চাকুরী পায় না অথচ জনসাধারণ অশিক্ষিত; শ্রমিক বেকার জীবন যাপন করে অথচ মানুষের অভাবের সীমা নাই, অনেক প্রয়োজনীয়

জিনিষই সকলের ব্যবহার করিবার মত উপযুক্ত পরিমাণে তৈয়ার হয় না—ইহাই হইল ধনিক সমাজের চিত্র।

এই চিত্রটি পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা ধনিক সমাজের নাই। যতদিন পর্য্যন্ত সমাজের উৎপাদনের-শক্তিগুলি কয়েকজনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিবে, যতদিন পর্য্যন্ত এইগুলি শ্রেণী-বিশেষের অলস জীবন যাপন করিবার জন্য মুনাফা সৃষ্টি করিতে ব্যবহৃত হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত সমাজের এই গলদ দূর হইতে পারে না। জিনিসপত্র বেশী তৈয়ার হইলে ধনিক সমাজের বিপদ অধিকতর বৃদ্ধি পায়, অধিক পরিমাণে পণ্য অবিক্রীত অবস্থায় জমা হইয়া যায়। তাহার ফলে আসে অর্থনৈতিক সঙ্কট ও তীব্রতর বেকার সমস্যা, প্রভৃতি। এইজন্যই বর্ত্তমানে ধনিকশ্রেণী বিজ্ঞানের উন্নতি আর চাহে না, অনেক ক্ষেত্রে তাহারা বিজ্ঞানের উন্নতির পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। ধনিক প্রথার প্রথম যুগে বিজ্ঞান উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিয়াছে। তখন পর্য্যন্ত পৃথিবীর বুকের সমস্ত জায়গা আবিষ্কৃত হয় নাই বা অধিকৃত হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে ধনিকশ্রেণী সমস্ত দুনিয়াটাকে তাহাদের পণ্যদ্রব্যের বাজারে পরিণত করিয়াছে। বিভিন্ন দেশের ধনিকেরা সমস্ত দুনিয়াটাকেই তাহাদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া লইয়াছে, এবং শোষণ করিতে করিতে সমস্ত দেশের ধনরত্নই একপ্রকার নিঃশেষ করিয়াছে। এই দিকে পরস্পর প্রতিযোগীতার ফলে প্রত্যেক দেশের ধনিকগণ এমন সব দানব-যন্ত্রের সৃষ্ট করিয়াছে যে, সেইগুলি পুরাপুরি ব্যবহৃত হইলে যে কোনও উন্নত দেশের যন্ত্রশিল্পই সমগ্র পৃথিবীর শিল্প-দ্রব্যের চাহিদা মিটাইতে পারে। ইংলণ্ডের যন্ত্রশিল্পের ক্ষমতা রহিয়াছে বর্ত্তমান জগতের শিল্প সম্ভারের সম্পূর্ণ চাহিদা মিটানোর, আমেরিকা বা জার্ম্মাণীরও ঠিক সেইরূপই ক্ষমতা রহিয়াছে। অথচ দুনিয়াটা সমস্ত ধনিক-সম্প্রদায়গুলির (ধনিক দেশগুলির) মধ্যে ভাগাভাগি করা। এদের একের অংশে অন্যে পণ্য বিক্রয় করিতে পারিবে না। ধনিকের এই সমস্যার তিনটি সমাধান হইতে পারে—এক, হয় পণ্যদ্রব্যের বাজারের পরিধি বৃদ্ধি, কিম্বা পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি, অথবা দুনিয়ার

বাজারে একচেটিয়া ব্যবসা চালাইবার মত রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ। কিন্তু, দুনিয়ার সমস্ত জায়গাই বিভিন্ন দেশের ধনিকদের মধ্যে ভাগাভাগি হইয়া যাওয়ায় আর নূতন করিয়া বাজারের পরিধি বৃদ্ধি করিবার প্রশ্নই উঠে না। দ্বিতীয়তঃ ধনিক সমাজের পক্ষে লোকের চাহিদা বাড়ান অসম্ভব, বরং ধনিকশ্রেণীর হাতে যতই ধন-সম্পত্তি জমা হইতেছে, সাধারণ লোকের অবস্থা দিন দিন ততই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। জনসাধারণই পণ্যদ্রব্যের সম্ভোগকারী বলিয়া সেই দারিদ্র্যের সঙ্গে শিল্পদ্রব্যের চাহিদাও কমিয়া যাইতেছে। অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময় যখন বহু মাল জমিয়া যায়, তখন ধনিকেরা এক হয় সেই মাল নষ্ট করিয়া ফেলিয়া নূতন মাল উৎপদনের পরিমান কমাইয়া দেয়, অথবা অল্প মূল্যে যাহাতে মাল তৈরী হইতে পারে সেইজন্য মজুরের মজুরী দেয় আরও কমাইয়া এবং খটুনি দেয় আরও বাড়াইয়া। ইহার পরিণামে হয় বেকারের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি, দ্রব্যসম্ভারের চাহিদা আরও সঙ্কুচিত এবং সঙ্কট আরও তীব্রতর। অথচ এই ভাবে পাগলামি করা ছাড়া অন্য কোনও প্রকারের এই সমস্যা সমাধান করিতে গেলে ধনিকদের অস্তিত্বই লোপ পায়, অর্থাৎ নিজে কাজ না করিয়া পরশ্রম (মুনাফা) ভোগ করিবার প্রথার মুলেই কুঠারাঘাত করা হয়। তাই ধনিকশ্রেণী তৃতীয় পন্থাই অবলম্বন করে, অর্থাৎ কতকগুলি দেশের যন্ত্রশিল্প ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং কোনও বিশেষ দেশের ধনিকগণ অন্যান্য সমস্ত দেশগুলিকে নিজের আওতায় আনিতে চেষ্টা করে, যাহাতে দুনিয়ার বাজারে একচেটিয়া কারবার চালান যায়। এইজন্যই ধনিক সমাজে ধনিক দেশগুলির মধ্যে পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ এবং দুনিয়ার এই ধ্বংসলীলা লাগিয়াই থাকিবে। এই ধ্বংসলীলাকে স্থায়ী করাই হইল কোনও প্রকারে ধনিকপ্রথাকে টিকাইয়া রাখিবার একমাত্র উপায়। ধনিক প্রথা যতদিন থাকিবে, এক দেশের ধনিকগণ কর্তৃক অন্য দেশের যন্ত্রশিল্প ধ্বংস করিবার চেষ্টা, অন্য দেশ দখলে আনিবার চেষ্টা ততদিনই চলিবে এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবিগ্রহও (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্য বা শোষণ করিবার মত জায়গা দখল করা কিম্বা দখলীভূত সাম্রাজ্য রক্ষা করা) ততদিনই স্থায়ী থাকিবে।

অনেকের নিকটই হয়ত ইহা অদ্ভুত লাগিবে, কেন ধনিকসমাজ অতিরিক্ত উৎপাদন হইলে উৎপাদিত দ্রব্যসম্ভার নষ্ট করিয়া ফেলে। অতিরিক্ত উৎপাদন অর্থ এই নয় যে, লোকের সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়া গিয়া কিছু বাড়তি হইয়াছে; ইহার অর্থ এই যে দ্রব্যসম্ভারের চাহিদা নাই অর্থাৎ লোকের যথেষ্ট প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কিনবার ক্ষমতার অভাব। অতিরিক্ত উৎপাদনের (ধনিকের ভাষা) অর্থ এই নয় যে লোকের প্রয়োজন নাই, পক্ষান্তরে ইহার অর্থ এই যে লোকের অভাব এত বেশী যে তাহাদের দ্রব্যসম্ভার কিনবার ক্ষমতা নাই, তাহারা প্রয়োজন মিটাইতে পারে না এবং সেইজন্য দ্রব্যসম্ভারের চাহিদা (বাজারে জিনিষ বিক্রয়) নাই। কাজেই জিনিষগুলি অযথা নষ্ট না করিয়া জনসাধারণের মধ্যে, অন্ততঃ গরীবদের মধ্যে কি ধনিকরা ইহা বিতরণ করিতে পারে না? ধনিক সমাজে উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিলেই প্রশ্নটা সহজ হইবে। ধনিক সমাজে সমস্ত উৎপাদনের উদ্দেশ্য হইল মুনাফা সৃষ্টি করা, যাহাতে উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণী পরিশ্রম-বিহীন অলস জীবন যাপন করিতে পারে। ইহার উদ্দেশ্য জনসাধারণের অভাব অভিযোগ মিটান নয়। ধনিক যখন কাপড়ের মিল খোলে বা বিস্কুটের কারখানা দেয়, তখন তাহার উদ্দেশ্য থাকে না যে দেশের নগ্ন জনসাধারণ কাপড় পড়িতে পারিবে, বা দেশের অভাবগ্রস্থ অভুক্ত লোক আরামে রুটি বিস্কুট খাইতে পারিবে। লোকের অভিযোগ বা প্রয়োজনের সঙ্গে এই উৎপাদনের কোনও সম্বন্ধ নাই, মুনাফা সৃষ্টি করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। কাপড়ের কলে মুনাফা হয় ত ভাল কথা, জুয়ার আড্ডা খুলিয়া বেশী লাভ হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই। ইংরাজ ধনিকদের জোর করিয়া চীনদেশে আফিম্ চালান দিবার কথা হয়ত অনেকেই শুনিয়াছেন। যাহাতে মুনাফা হয় না এমনভাবে ধনিক তাহার দ্রব্যসম্ভার ব্যবহার করিতে পারে না, কেন না তাহা হইলে সে আর ধনিক থাকিবে না। লোকের অভাবের দরুণ কাপড় মুনাফায় বিক্রয় হইতেছেনা দেখিয়া কাপড়ের কলের মালিক যদি বিনামূল্যে কাপড়গুলি নগ্ন গরীবদের মধ্যে বিলাইয়া দেয়, বা ময়দার কারখানার মালিক যদি ময়দা গুদাম-জাত হইতেছে

দেখিয়া তাহার ময়দা দুঃস্থ অভুক্তদের মধ্যে বিতরণ করে, তাহাতে ভগবান খুসী হইবেন কিনা জানিনা, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে বহুদিন পর্য্যন্ত বাজারে কাপড়ের বা ময়দার চাহিদা থাকিবে না এবং কারখানা ফেল পড়িবে। যে লোকগুলি জীবন রক্ষা করিবার আকুল আগ্রহে কাপড় ও ময়দা কিনিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিত এবং যে কোন উপায়েই হউক হয়ত তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সামান্য কিছু কিনিবার মত অর্থ সংগ্রহ করিত, সেই লোকগুলির কিনিবার কোনও তাগিদই থাকিবে না। কাজেই অন্ততঃ ভবিষ্যতে যে কাপড়-কলের মালিক ও ময়দার কারখানার মালিকের ব্যবসা চলিবার ও কিছু লাভ হইবার সম্ভাবনা ছিল, বদান্যতার ফলে তাহাও নির্ম্মূল হইল। পুণ্য সঞ্চয় করিতে গিয়া ব্যবসা মাটি হইয়া গেল, কারবার ফেল পড়িল। ধনিকরা এইভাবে ব্যবসা মাটি করতে রাজী নয়; ধনিক সমাজে তাই দেখি জিনিষ বাড়তি হইলেই অগণিত দ্রব্যসম্ভার নষ্ট করা হইতেছে। এইজন্য কোনও একজন ধনিক দায়ী নয় বা ইহার কারণ এই নয় যে ধনিকরা খুবই নির্দ্দয়। ইহার কারণ ধনিক প্রথা, যে প্রথার একমাত্র উদ্দেশ্য, মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর জন্য মুনাফা সৃষ্টি করা। তাই দেখি আমাদের চতুর্দ্দিকে অভাব অভিযোগ, অথচ আমাদের দেশে যন্ত্রশিল্পের সামান্য যাহা কিছু প্রচলন হইয়াছে তাহাও পুরামাত্রায় ব্যবহৃত হয় না। বাংলাদেশে তথা সারা ভারতে কয়টাই বা কাপড়ের কল, জনগণের প্রয়োজনের ইহা কত-টুকুই বা মিটাইতে পারে? কতলোক বস্ত্রাভাবে নগ্ন বা অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় দিন কাটাইতেছে, অথচ আমরা সব সময়েই শুনি কাপড় বেশী উৎপন্ন হইয়াছে, কাপড় গুদামজাত হইতেছে, বিক্রী নাই ইত্যাদি। কাপড়ের কলে খুব কমই পুরা সময় কাজ চলে; কয়টা মিল দিন রাত্রি কাজ চালায়? আমাদের দেশে কয়জন সৌভাগ্যবান চিনি খাইতে পারে? অথচ "অতিরিক্ত উৎপাদনের" জন্য একে একে অনেক চিনির কারখানাই বন্ধ হইয়াছিল কিছু আগে। ধনিকরাও যে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন চাহে না তাহা নয়, কিন্তু মুস্কিল এই যে ধনিক প্রথা বজায় রাখিয়া এই সমস্যার সমাধান হয় না। তাই, বর্ত্তমানে ধনিক ব্যবস্থায় পূর্ব্বের মত শিল্পের উন্নতি ও প্রসার হইতে পারে না, (ধনিক সমাজ বরং মাঝে মাঝেই

উৎপাদন-যন্ত্র ধ্বংস করিয়া সমাজের উৎপাদন ক্ষমতা কিছু কিছু হ্রাস করে।) বর্ত্তমানে ধনতন্ত্র বিজ্ঞানের আর উন্নতি সাধন করিতে অক্ষম, ইহা প্রতিক্রিয়াশীল, পুরাতনটাকে কোন রকমে আঁকড়াইয়া রাখিতে পারিলেই বাঁচিয়া যায়।

প্রশ্নমালা

১। মজুরী কি? ইহা কিভাবে নির্দ্ধারিত হয়?

২। "মজুরের শ্রমের মূল্য শ্রমশক্তির মূল্যের চাইতে বেশী"—ভালভাবে বুঝাও।

৩। মুনাফা কোথা হইতে আসে? পণ্য কি?

৪। অনেকে ধনিক সমাজের দুঃখ কষ্টের জন্য যন্ত্র-শিল্পকে দায়ী করেন—তাঁহাদের মতের ভুল কোথায়?

৫। "ধনিক ব্যবস্থা যতদিন থাকিবে, যুদ্ধ-বিগ্রহও ততদিন চলিবে"—ইহা কি ঠিক? কারণ দেখাও।

৬। অর্থ সঙ্কটের সময় মজুরের মজুরী না কমাইয়া বরং বাড়াইয়া দিলে কি সঙ্কট দূর হইবে না?

৭। লোকের অভাব অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও ধনিক-সমাজ মাঝে মাঝে উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভার নষ্ট করিয়া ফেলে কেন? এইগুলি কি গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা চলে না?

৮। ধনিক প্রথা কি? সংক্ষেপে আলোচনা কর।

সাত

ধনিক সমাজের গলদগুলি দূর করিবার জন্য যে সমাজ-ব্যবস্থা দরকার তাহার নাম সমাজতন্ত্র। ধনিকদের শ্রেণী-স্বার্থ কোনও প্রকারে ধনিক ব্যবস্থা টিকাইয়া রাখা। কিন্তু ধনিক সমাজে অধিকাংশ লোকের স্বার্থ সমস্ত শ্রমজীবী-দিগের স্বার্থ (সমাজতন্ত্র) প্রতিষ্ঠা করায়। ধনিক সমাজের সকল গলদগুলির মূলে রহিয়াছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সমাজের অধিকাংশ যাহারা, উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক তাহারা নয়, তাহাদের ভোগ করিবার অধিকার ধনিক-শ্রেণীরই, যাহারা সমুদয় উৎপাদন-শক্তিগুলিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করিয়াছে, কিন্তু উৎপাদনের জন্য যাহারা কোনও পরিশ্রমই করে না। অধিকাংশ লোক উৎপাদন করে, মুষ্টিমেয় লোকে তাহা ভোগ করে; উৎপাদন হয় সামাজিক কিন্তু উপভোগ ব্যক্তিগত—ইহাই হইল সকল গলদের মূল। কাজেই এই গলদগুলিকে দূর করিতে হইলে প্রথমেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন করিয়া ইহাকে সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করিতে হইবে, অর্থাৎ উৎপাদন-শক্তিগুলি কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিবে না, ইহা হইবে সমাজের সম্পত্তি, যাহারা উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে তাহাদের সকলের যৌথ সম্পত্তি। উৎপাদন হইবে সামাজিক উৎপাদন এবং উপভোগ ও হইবে সামাজিক। উৎপাদন জন্য পরিশ্রম করিবে (তাহা শারীরীকই হউক কি মানসিকই হউক), অর্থাৎ যাহারা শ্রমজীবী তাহারা সকলে মিলিয়া হইবে উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক। জমিজমা, কল কারখানা, রেল ষ্টীমার, খনি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সমস্ত কিছু উৎ-পাদনের উপায়গুলি হইবে শ্রমজীবীদের রাষ্ট্রের অধীন; এই গুলির উপর সমস্ত

শ্রমজীবীদের সমান অধিকার থাকিবে। সামাজিক উৎপাদনে অংশ নিতে যাহারা নারাজ অর্থাৎ সমাজের সকলের প্রয়োজনে পরিশ্রম করিতে যাহারা রাজী নয়, তাহাদের ভোগ করিবারও কোন অধিকার নাই; সমাজের প্রয়োজনে যাহারা পরিশ্রম করিবে শুধু তাহারাই ভোগ করিবে।

ধনতান্ত্রিক সমাজে সমস্ত উৎপাদনের মূলে রহিয়াছে মুনাফা সৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তি। মুনাফাই ধনিক সমাজে উৎপাদনের প্রেরণা যোগায়। মুনাফা সৃষ্টি না হইলে উৎপাদন-শক্তিগুলির মালিকদের বসিয়া খাওয়া চলে না। শ্রমজীবী-গণ পরিশ্রম করিয়া দ্রব্যসম্ভার উৎপাদন করিবে, কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণ শ্রমের মূল্য বাবদ মজুরী পাইবে না, ইহার অনেকটা অংশই মালিকরা মুনাফা বাবদ কাটিয়া লইবে; মুনাফাটা হইল ধনিক সমাজের শোষণ। উৎপাদন-শক্তিগুলির মালিক যে-হেতু মুষ্টিমেয় ধনিকগণ, সেইজন্যই তাহারা এইভাবে শ্রমজীবীদের শোষণ করিতে পারে। কেননা ধনিকদের উৎপাদনের উপায়গুলি লইয়া কাজ করিবার জন্য মজুরীর বিনিময়ে নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করা ভিন্ন শ্রমজীবীদের জীবিকা-নির্ব্বাহের আর কোনও সংস্থান নাই। ইহারই পরিণামে বেকার সমস্যা, ভীষণ অর্থনৈতিক সঙ্কট, অভাব, অনাহার এবং ধনিক সমাজের আরও যত সব গলদ। অথচ এই মুনাফা সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি—উৎপাদন-শক্তিগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা-স্বত্ব।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে এইজন্যই ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন হইবে, উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক কোনও ব্যক্তিবিশেষ থাকিবে না। তবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন করিতে সাম্যবাদীগণ কি বুঝায়, এই সম্বন্ধে অনেক ভুল ও মিথ্যা প্রচার হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির (Private Property) বিলোপ সাধন অর্থ এই যে, যে সম্পত্তির মালিকানা-সত্বের জোরে অন্য লোককে শোষণ করা চলে, তেমন সম্পত্তির মালিক কোনও ব্যক্তিবিশেষ হইতে পারিবে না, এক কথায়, উৎপাদন-শক্তিগুলির মালিক কোন ব্যক্তি বিশেষ হইতে পারিবে না। এই কথার অর্থ এই নয় যে, কাহারও কোন নিজের সম্পত্তি (**Personal Property**) থাকিবে না। নিজের প্রয়োজনীয় ব্যবহারের জিনিষের উপর

সকলেরই নিজস্ব অধিকার থাকিবে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ যতই অগ্রসর হইবে, ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তির পরিমাণ ততই বাড়িবে—প্রত্যেকটি লোকের সুখ সুবিধা ভোগের জন্য নিজস্ব সম্পত্তির ক্রমাগত বৃদ্ধি করাই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য। সমাজতান্ত্রিক সমাজে সকলেই সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন করিবে এবং সকলেই ভোগ করিবে, কাজেই মুনাফা সৃষ্টি করিবার প্রশ্ন আসে না। সমাজের সকলের জন্য যত দ্রব্যসম্ভার প্রয়োজন, সকলে মিলিয়া তত জিনিষই উৎপাদন করিবে; সমাজের প্রয়োজনে উৎপাদন হইবে, কাহারও মুনাফা সৃষ্টি করিবার জন্য নয়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে অতিরিক্ত উৎপাদনের ভয় পাইবার কিছুই নাই। উৎপাদন যতই বাড়িবে, সমাজের লোকের ততই মঙ্গল, তাহাদের অভাব অভিযোগ তত বেশী দূর হইবে। সকলের ব্যবহারের জন্য উৎপাদন, তাই বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন সমাজতান্ত্রিক সমাজের কাম্য। সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিজ্ঞানের উন্নতি হইলে ধনিক সমাজের মত বেকার-সমস্যা বাড়িবে না, লোকের সুযোগ সুবিধা আরাম আনন্দ বাড়িবে। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে যদি এমন সব যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয় যাহাতে কম লোক বেশী কাজ করিতে পারে, তাহা হইলেই অনেক লোক বেকার হইয়া পড়িবে না, উৎপাদনের বিশেষ কোনও শাখায় যাহাদের কাজের দরকার নাই তাহারা অন্য কোন নূতন শাখায় কাজ করিবে (মানুষের প্রয়োজনের ত আর শেষ নাই); আর যদি এমনই হয় যে উৎপাদনের সকল দিকেই উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট হইয়াছে, তখন লোকের খাটুনির সময় কমিবে, যথেষ্ট ছুটি মিলিবে, তবু লোক বেকার হইবে না। একটি উদাহরণ ধরা যাক। বাংলাদেশে কাপড়ের কলে প্রতি তাঁতী সাধারণতঃ দুইটি তাঁত চালায় এবং তাহারা সপ্তাহে সাধারণতঃ চুয়াম্ন ঘণ্টা কাজ করে। বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বস্ত্র-শিল্প এত বেশী উন্নত হইয়াছে যে, উন্নত ধরনের কলকব্জার সাহায্যে প্রতি তাঁতীর পক্ষে কুড়ি পঁচিশখানা তাঁত চালান সম্ভবপর। আমাদের দেশে বর্ত্তমান ব্যবস্থায় যদি এই উন্নত প্রথা প্রবর্ত্তন করা হয়, তাহা হইলে প্রতি দশ জন তাঁতীর মধ্যে

নয় জনই বেকার হইয়া পড়িবে, ঠিক যেমন বাষ্প-চালিত বস্ত্রশিল্প আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বহু কৃষিশিল্পী বেকার হইয়া পড়িয়াছে, যন্ত্র-শিল্পে সকলে স্থান পায় নাই। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে এইরূপ হইবে না ; বস্ত্রের উৎপাদনের পরিমাণ এমন ভাবে বাড়ান হইবে যেন সকল লোক যথেষ্ট পরিমাণ ভাল ভাল কাপড় চোপড় ব্যবহার করিতে পারে ; কাজেই নূতন নূতন মিল বসিবে, অনেক তাঁতীর দরকার হইবে। ইহার পরেও যদি তাঁতীর সংখ্যা অতিরিক্ত থাকিয়া যায়, তাহা হইলে অতিরিক্ত লোকদিগকে নূতন কোনও শিল্পে নিয়োগ করা হইবে এবং শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোকের বিশ্রামের সময় ক্রমেই বাড়ান হইবে। মোটকথা, যন্ত্র ব্যবহৃত হইবে মানুষের সুবিধার জন্য, খাটুনি কমান এবং আরাম বাড়াইবার জন্য ; যন্ত্রের জন্য মানুষ নয়, মানুষের প্রয়োজনে যন্ত্র। বস্ত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে তাঁতীরা হইল বেকার, জুতার কারখানা বসার সাথে সাথে মুচীরা মারা পড়িল, কারবন্ কাগজ ও টাইপ করিবার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইবার সাথে সাথে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়িল, কেরাণীর বেতন কমিল—ধনিক সমাজের চিত্র সর্ব্বত্রই এইরূপ। বিজ্ঞানের উন্নতি হইলে বেকারের সংখ্যা বাড়ে, তাই যাহাদের কাজ থাকে তাহাদেরও খাটুনির পরিমান এবং তীব্রতা বাড়ে ; অথচ মজুরী যায় কমিয়া, কম মজুরীতে বেশী খাটুনি করিতে কেহ নারাজ হইলে বেকারদের মধ্য হইতে কাজের জন্য বহু লোকই পাওয়া যায়। যে-বিজ্ঞান সমাজের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইলে মানুষের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া জীবন সহজ এবং সুখময় করিতে সক্ষম, সেই বিজ্ঞান ধনিক সমাজে লোকের মনে ভীতি ও আতঙ্কের সঞ্চার করে।

আমরা বলিয়াছি যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের উপায়গুলির উপর সমাজের সকলের সমান অধিকার, সকলেই উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করিবে এবং সকলেই উৎপন্ন সামগ্রী ভোগ করিবে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, প্রথমেই বিতরণে এমন ব্যবস্থা হইলে কতকগুলি কারণে সমাজ অচল হইয়া পড়িবে। ধনিকতন্ত্র ধ্বংস করিয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজে দ্রব্যসম্ভারের উৎপাদনের পরিমাণ, তাহাতে এত বাড়িয়া যাইবে না

যে, যাহার যতটা দ্রব্যসম্ভার প্রয়োজন, ততটাই দেওয়া যাইবে। প্রথম প্রথম প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভারের যথেষ্ট অভাব থাকিয়া যাইবে। সকলের অভাব ভালভাবে মিটাইবার মত দ্রব্যসম্ভার উৎপন্ন করিবার জন্য দেশ-জোড়া শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়িয়া তুলিতে এবং উহা চালু করিবার মত উপযুক্ত কারিকরকে শিক্ষা দিতে অন্ততঃ কয়েক বৎসর দরকার। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের প্রথম অবস্থায় মানুষের মনে ধনিক সমাজের অভ্যাস ও ভাবধারার প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে থাকিয়া যাইবে। ধনিক সমাজ তাহার রাষ্ট্র, আইন-কানুন, শিক্ষা-দীক্ষা-প্রভৃতির ভিতর দিয়া লোকের মনের ভিতর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা রাতারাতি পরিবর্তিত হইতে পারে না। ইহাকে দূর করিয়া লোকের মনে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও ভাবধারার প্রভাব সৃষ্টি করিবার জন্য অনেক দিনের সামাজিক শিক্ষার দরকার হইবে। বহুদিনের শিক্ষার ভিতর দিয়াই মানুষ বৃহত্তর সমাজ-স্বার্থকে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ হইতে বড় করিয়া দেখিবে এবং ইহা বুঝিবে যে, প্রকৃতপক্ষে সমাজের উন্নতি ও বিকাশের উপরই মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ নির্ভর করে; দশজনকে বাদ দিয়া কোনও একজনার স্বার্থ ঠিক ঠিক মত পূর্ণ ও রক্ষিত হইতে পারে না।

সমাজতন্ত্রের প্রথম অবস্থায় যদি দ্রব্যসম্ভার সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করা হয়, তাহা হইলে একদিকে দ্রব্যসম্ভারের অনটন এবং অন্যদিকে সামাজিক শিক্ষা ও মনোভাবের অভাবে সমাজ অচল হইয়া পড়িবে। বসিয়া খাওয়া ও কাজে ফাঁকি দিবার মনোবৃত্তি (যাহা ধনিক সমাজের রেওয়াজ) যাহাদের রহিয়া গিয়াছে, তাহারা নানা অজুহাতে কাজে কামাই দিবে বা কম কাজ করিবে। অন্যদিকে ভাল কর্ম্মী যাহারা, যে সকল নিপুণ কারিকর, শিল্পী প্রভৃতির উপর সমাজের ভবিষ্যৎ দ্রুত-উন্নতি নির্ভর করে—তাহারা দেখিবে যে অতিরিক্ত কঠিন ও উন্নত ধরণের কাজকর্ম্ম করিলেও কোন লাভ নাই। দ্রব্যসম্ভার যথেষ্ট না পাইবার জন্য নেহাৎ অভাব অনটনেই দিনাতিপাত করিতে হয়, কোনও পুরস্কারের আশা নাই; তাই তাহারা কাজে তেমন মনোযোগ দিবে না। আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া উৎকৃষ্ট ধরণের কাজ করা ও নূতন

কিছু আবিষ্কার করিবার দিকে তাহাদের নজর দিবার মত উৎসাহের খুবই অভাব ঘটিবে। যতটুকু কাজ না করিলে নয়, ততটুকুই কাজ হইবে। কর্ম্মপ্রেরণার অভাবে শিল্প ও শিক্ষার উন্নতি হইবে না, অপর্য্যাপ্ত দ্রব্যসম্ভার উৎপাদন করিয়া সকলের অভাব অনটন মিটান আর কোনদিনই হইয়া উঠিবে না। নিপুণ কারিকর, ভাল ইঞ্জিনীয়ার, বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, জ্ঞানী শিক্ষক, দক্ষ চিকিৎসক, বিখ্যাত শিল্পী, উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক—নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিবার মত সকল ক্ষেত্রেই ভাল কর্ম্মীর অভাব হইবে। সাম্যবাদী যাহারা, শুধু উচ্চ আদর্শই তাহাদিগকে অফুরন্ত কর্ম্মপ্রেরণা যোগায়; কিন্তু সমাজের সব লোকই তো আর সাম্যবাদী শিক্ষা ও ভাবধারায় দীক্ষিত নয়!

কাজেই সমাজতান্ত্রিক সমাজে দ্রব্য-সম্ভার উৎপাদন-ব্যবস্থা হইবে এইরূপ—সকলেই সামাজিক উৎপাদনে পরিশ্রম বা কাজ করিবে এবং কাজ অনুযায়ী ভোগ করিবে। যে কর্ম্মী যত বেশী বা যত উন্নত কাজ করিবে, সমাজের পক্ষে যত বেশী প্রয়োজনীয় কাজ করিবে, সেই কর্ম্মী তত বেশী জিনিস ভোগ করিবার অধিকারী হইবে। সকলেই বেশী কাজ করিলে, সকলেই বেশী ভোগ করিতে পারিবে। যে কম খাটুনি করে আর যে বেশী খাটুনি করে, তাহাদের দুজনাকেই যদি একই রকম ভোগের অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ন্যায় বিচার হয় না—আর তাহাতে সমাজও অচল হইয়া পড়ে। কাজ অনুযায়ী ভোগের ব্যবস্থা হইলে, সমাজ দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে চলিবে, দ্রব্যসম্ভারের উৎপাদন অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইবে, সমাজের সর্ব্বমুখী উন্নতির জন্য সকলেই আপ্রাণ চেষ্টা করিবে। কেননা, সকলেই জানে যে, তাহার পরিশ্রম অনুযায়ী সে পুরস্কৃত হইবে নিশ্চয়ই। এইদিকে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিশেষ নজর রাখিবে যেন, ধনিক সমাজের মত লোকের আয়ের মধ্যে এমন ব্যবধান না হয় যে, কাহারও পেটপূর্ত্তি খাওয়াই জোটে না আর কেহ বা ভোগ-বিলাসে ডুবিয়া থাকিয়াও অর্থ শেষ করিতে পারে না। নিম্নতম আয় করিয়া, লোকের যাহাতে মোটামুটি ভাল ভাবেই দিন কাটে—বণ্টন-ব্যবস্থা সেইরূপই করা হইবে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যাহারা কাজ করিতে অক্ষম, তাহাদের খাওয়া পরা মিলিবে কিনা। সমাজতান্ত্রিক সমাজ সম্বন্ধে স্বার্থান্বেষী নিন্দুকগণ এই-রূপ প্রচার করিয়া থাকে যে, সেখানে অক্ষম ও পঙ্গুদিগকে সমাজ হইতে বিলুপ্ত করা হইবে। কিন্তু সমস্ত মিথ্যা প্রচারকে আজ ধূলিসাৎ করিতেছে সোভিয়েট ইউনিয়নের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। সেখানে যাহারা বার্দ্ধক্য, স্বাস্থ্যহীনতা প্রভৃতি কারণে কাজ করিতে অক্ষম বলিয়া বিবেচিত হয়, রাষ্ট্র হইতে তাহাদের ভরণ-পোষণের সুব্যবস্থা করা হয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে যে যেমন কাজের উপযুক্ত সে সেইরূপ কাজ করে; কিন্তু যদি কেহ কাজ করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহাকে অবজ্ঞায়, অচিকিৎসায় বা অনাহারে মরিতে হয় না।

আর একটি প্রশ্ন। সমাজতান্ত্রিক সমাজে যাহার আয় কম, তাহার ছেলে-মেয়েরা কি যে ব্যক্তির আয় বেশী তাহার ছেলেমেয়েদের চাইতে শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ সুবিধা কম পায় না? ধনিক সমাজে অবশ্য এমনই ব্যবস্থা। গরীবের ছেলের জীবনে উন্নতি করিবার মত সুযোগ সুবিধা নাই। সমাজতান্ত্রিক সমাজে যদি ইহাই ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে আর সমান অধিকারের প্রশ্ন রহিল কোথায়? জন্মের জন্য তো কেহ দায়ী নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমাজতান্ত্রিক সমাজের ব্যবস্থা এইরূপ নহে; সেখানে জীবনে উন্নতি করিবার সুযোগ সুবিধা সকলেরই সমান, রাষ্ট্র সকলের শিক্ষার ব্যয় বহন করে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, সকলকেই ইহা গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া যে দিকে যাহার মন যায় বেশী, সেইদিকে সে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করিবে। যে নিম্ন শ্রেণীতে ভাল ফল করে, সে-ই উচ্চ শিক্ষার অধিকারী হয়; যাহার পিতার আয় বেশী সে নয়।

অল্প কথায়, সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক সমাজের সকলে। কোনও ব্যক্তিবিশেষ নয়। উৎপাদন হয় সমাজের সকলের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য। ব্যক্তিবিশেষের লাভের জন্য নয়। সক্ষম সকলকে সমাজের জন্য শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিতে হয় এবং পরিশ্রম অনুযায়ী ফল

সকলেই ভোগ করে; আর, জীবনে উন্নতি করিবার সুযোগ সুবিধা সকলেরই সমান।

অনেকে জিজ্ঞাসা করেন—সমাজতান্ত্রিক সমাজে যে যেমন উৎপাদন করে, সে যদি তাহা ভোগ করে, তাহা হইলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তাহার খরচ যোগাইবে কোথা হইতে? এই সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। প্রত্যেক কর্ম্মী যাহা উপার্জন করিবে, তাহার একটা অংশ হইবে রাষ্ট্রের প্রাপ্য, রাষ্ট্রের খরচ বাবদ। অবশ্য, যেহেতু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটা শ্রমজীবীদেরই রাষ্ট্র, তাই যে অর্থ রাষ্ট্রের জন্য ব্যয় হইবে, তাহা প্রকারান্তরে শ্রমজীবীদেরই সুযোগ সুবিধা বাড়াইবে; তাহাদের সকলের মঙ্গলার্থ ব্যয় হইবে।

আর একটা কথাও মাঝে মাঝে শুনা যায়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে যদি উপার্জ্জনের ব্যবধান থাকে, তাহা হইলে যাহাদের উপার্জ্জন বেশী, তাহারা কি ক্রমে ধনিকে পরিণত হইবে না? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সমাজ-তান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন-শক্তিগুলিকে কেহ ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করিতে পারিবে না কাজেই ধনিক সমাজের মনোবৃত্তি হইতে যদি কেহ অর্থ জমায়ও, তাহাতে ভয় পাইবার কিছুই নাই। কেননা এই টাকা দিয়া কাহাকেও শোষণ করা চলিবে না, তাহা আইন-বিরুদ্ধ হইবে; কোনও কর্ম্মী পারিবারিক প্রয়োজন বা সখ মিটাইবার জন্য, কিম্বা সমাজের পক্ষে হিতকর কোনও কাজের জন্য তাহার উপার্জ্জিত টাকা শুধু নিজেই ব্যবহার করিতে পারিবে।

প্রশ্নমালা

১। শ্রমজীবীগণ ধনিক শ্রেণীকে মুনাফা দিতে রাজী হয় কেন? কি অধিকারে ধনিকগণ শ্রমিকগণকে শোষণ করিতে পারে।

২। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন বলিতে কি বুঝায়? ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও নিজস্ব সম্পত্তির মধ্যে প্রভেদ কি?

৩। সমাজতান্ত্রিক সমাজে কি বেকার-সমস্যা থাকিবে না? কেন?

৪। সমাজতান্ত্রিক-সমাজে দ্রব্য-সম্ভার সকলের ভিতর সমান ভাবে বণ্টন হইবে না কেন?

৫। সমাজতান্ত্রিক-সমাজে যাহারা বেশী টাকা উপার্জন করিবে, তাহারা কি অন্যকে শোষণ করিতে পারিবে না?

৬। সমাজতান্ত্রিক সমাজে সকলে সমান সুযোগ সুবিধা পাইবে কি ভাবে?

৭। যাহারা কাজ করিতে অক্ষম, সমাজতান্ত্রিক সমাজ তাহাদের কি বন্দোবস্ত করিবে?

৮। ধনিক সমাজে উৎপাদনের মূখ্য উদ্দেশ্য কি? আর সমাজতান্ত্রিক সমাজে?

৯। অল্প কথায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কিরূপ তাহা বুঝাইয়া বল।

আট

সমাজতন্ত্রের ভিতর দিয়া মানবসমাজের সকল দিকে উন্নতি হইবে। এক দিকে দ্রব্যসম্ভারের উৎপাদন অসম্ভব রকম বাড়িয়া যাইবে এবং আর একদিকে ব্যাপক শিক্ষা ও প্রচারের ফলে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও ভাবধারায় মানুষের মন গড়িয়া উঠিবে। এই ব্যবস্থা কিছুকাল চলিলে উৎপাদনের বহু উৎকর্ষ হইবে এবং পরিমাণ এত বাড়িয়া যাইবে যে, সাধারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সকলেই প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ করিতে পারিবে। কালক্রমে এই উৎপাদন এত বৃদ্ধি পাইবে যে, তখন সমুদয় দ্রব্যসামগ্রীই যাহার যেইমত দরকার, সেই-মত ব্যবহার করিতে পারিবে। মানুষের ভোগের জিনিসের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িবে এবং অবশেষে এমন সময় আসিবে, যখন সমাজে কোন জিনিসেরই অভাব থাকিবে না। এইরূপ যখন অবস্থা দাঁড়াইবে তখন দ্রব্যসম্ভার বিতরণ সম্পর্কে আর পূর্ব্ব নিয়ম প্রচলিত রাখিবার কোনও দরকার থাকিবে না। এই সময়ে সমাজের বণ্টন-ব্যবস্থা হইবে এইরূপ—সকলেই তাহাদের ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করিবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করিবে। এই ব্যবস্থাকেই বলা হয় সাম্যবাদ বা কমিউনিজম। তবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রথম অবস্থায় বণ্টন-ব্যবস্থা এইরূপ হওয়া অসম্ভব। কেন না, তখন সকলের সমস্ত রকম প্রয়োজন মিটাইবার মত যথেষ্ট পরিমাণ দ্রব্যসম্ভার উৎপাদন করা সম্ভবপর হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, বহুদিনব্যাপী সামাজিক শিক্ষার ভিতর দিয়া সামাজিক মনোবৃত্তি গড়িয়া না উঠিবার ফলে, যাহার যেমন সামর্থ্য, সেইমত কাজের ব্যবস্থা হইলে ধনিক-সমাজ-সুলভ মনোবৃত্তির ফলে

প্রায় সকলেই কাজে ফাঁকি দিতে সুরু করিবে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতর দিয়া সমাজ অনেক দিন অগ্রসর হইলেই পরে সাম্যবাদী ব্যবস্থা আসিতে পারে। সকলেই প্রয়োজন মত সব কিছু পাইবে বলিয়া কাহারও মনে কোন অসন্তোষ থাকিবে না এবং সন্তুষ্টি ও সামাজিক শিক্ষার ফলে কেহ কাজে ফাঁকি দিবে না। অবশ্য, সমাজতান্ত্রিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া সাম্যবাদী ব্যবস্থা আসিতে বহুদিন চলিয়া যাইবে এবং পৃথিবীর অন্ততঃ প্রধান প্রধান দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইলে সাম্যবাদ আসিতে পারে না। তবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ যতই অগ্রসর হইবে, উৎপাদন ততই বাড়িবে এবং মানুষের অভাব অভিযোগ ততই কমিয়া আসিতে থাকিবে; ক্রমে সমাজ-তান্ত্রিক সমাজে প্রয়োজনীয় সাধারণ দ্রব্যসম্ভারগুলির কাহারও অভাব থাকিবে না। সকলেই এইগুলি প্রযোজন মত ভোগ করিবার সুযোগ পাইবে। পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে অনেক সময় লাগিলেও সমাজতন্ত্রের উল্লিখিত রূপ উন্নত স্তরে পৌছাইতে খুব বেশী দিন লাগিবে না।

সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র ক্রমেই অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িবে। রাষ্ট্রের বিশেষ কাজ থাকিবে না এবং অবশেষে ইহা লুপ্ত হইয়া যাইবে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য রাষ্ট্র অন্যান্য শ্রেণীকে শাসন করিবার একটি নির্য্যাতন-যন্ত্র মাত্র। কাজেই, সমাজে যখন কোনও শোষণ থাকিবে না, শ্রেণী-বিভেদ যখন লোপ পাইবে, যখন সকলেই সমাজের প্রয়োজনে পরিশ্রম করিবে, সকলেই হইবে শ্রমজীবী, তখন সকলেই প্রয়োজন মত ভোগ করিতে পাইবে। যখন সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা-দীক্ষার ফলে পরিশ্রম করা হইবে সম্মানের, যখন সমাজের জন্য যে যত বেশী পরিশ্রম করিবে তাহারই তত বেশী সমাদর, শিক্ষা-দীক্ষা, রীতিনীতি, সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতি সব কিছুর ভিতর দিয়াই যখন সাম্যবাদের আদর্শ প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন কাহারও মনে ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তি জাগিবে না—আর যদি কেহ ফাঁকি দেয়ই, তাহা হইলে সে সমস্ত সমাজের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হইবে। অসামাজিক

(সমাজ-বিরোধী) অকর্ম্মণ্য ও ফাঁকিবাজ লোককে তখন সকলে ঘৃণার চক্ষুতে দেখিবে, সমাজের বিধান ও রীতিনীতি তখন সকলেই নিজ নিজ শিক্ষাগুণে অলঙ্ঘনীয় বলিয়া মনে করিবে, তখন সমাজের সকলের মঙ্গলের জন্য তৈয়ারী নিয়ম শৃঙ্খলা যদি কেহ লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে জনগণের মতের প্রবল চাপই তাহাকে সংশোধন করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। এক কথায় মানুষ যখন হইবে মহৎ, তখন আর জুলুম চালাইবার জন্য কোনও যন্ত্রের প্রয়োজন হইবে না। আইন-কানুন, জোর জুলুমের দরকার হয় তখনই, যখন সামাজিক শিক্ষার অভাবেই হউক, বা ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণী বিশেষেব পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়াই হউক, সাধারণ লোক আপনা হইতে কোনও বিধান মানিয়া চলিতে রাজী হয় না। কিন্তু যখন সমাজের সকল বিধানই হইবে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য এবং সামাজিক শিক্ষার ফলে জনসাধারণ যখন ইহা ভালভাবেই উপলব্ধি করিতে পারিবে, তখন আর আইন কানুন, জোর জুলুম চালাইবার মত পাত্র মিলিবে কোথায়? সমাজের সকলের মঙ্গলের জন্য যেভাবে চলা দরকার, শিক্ষাগুণে সকলে আপনা হইতেই সেইভাবে চলিবে বলিয়া, জোর জুলুমের কোনও প্রয়োজন থাকিবে না বলিয়া, সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্র-যন্ত্র ও তাহার সংলগ্ন যত প্রতিষ্ঠান—আইন-কানুন সিপাহী শান্ত্রী, ফৌজদারী আদালত, জেল, ফাঁসী প্রভৃতি—সব কিছুই অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ায় ক্রমে লুপ্ত হইয়া যাইবে।

সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা লোপ পাইবে কথার অর্থ এই নয় যে, সেখানে কোনও বিধি-বিধান থাকিবে না, সকলেই খামখেয়ালী ভাবে চলিবে। সাম্যবাদী সমাজে মানুষ এতদূর শিক্ষিত ও সচেতন থাকিবে যে, সেখানে কোন বিধি-বিধানের পিছনে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রয়োজন থাকিবে না, মানুষ আপন আপন কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এতটা সজাগ ও কর্ত্তব্য সম্পাদনে এতটা আগ্রহশীল থাকিবে যে, সামাজিক কাজকর্ম্মের জন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হইবে না। তখন সমস্ত মানুষ হইবে সকলের সচেতন ইচ্ছায় সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠানের সভ্য। সকলের সুবিধার জন্য প্রতিষ্ঠানের বিধি-বিধানগুলি তাহারা

সকলে স্থির করিবে এবং সকলেই এইগুলি কর্ত্তব্যজ্ঞানে প্রতিপালন করিবে। সাম্যবাদী সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলাগুলি হইবে একটি সমিতির নিয়মশৃঙ্খলার মত। সকলের উদ্দেশ্যের ঐক্য এবং সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার দায়িত্ব সম্বন্ধে সকলের সচেতনতাই হইবে সাম্যবাদী সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলার পিছনের শক্তি।

নৈরাজ্যবাদী (এনার্কিষ্ট) নামে এক মতাবলম্বী লোক আছেন, যাঁহারা মনে করেন, ধনিকতন্ত্র ধ্বংস করিবার সাঙ্গে রাষ্ট্রের উচ্ছেদ করিয়া সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাঁহাদের মতে, রাষ্ট্রই সমস্ত অনর্থ ও অত্যাচারের কারণ। কাজেই রাষ্ট্রকে এক মুহূর্ত্তও বরদাস্ত করা ঠিক নয়। তাঁহাদের ধারণা, রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করিলেই, সমস্ত রকমের অন্যায় অবিচার লোপ পাইবে। কিন্তু নৈরাজ্যবাদীগণ কল্পনা-বিলাসী মাত্র। ধনিকতন্ত্র ধ্বংস হইবার একই সঙ্গে ধনিক সমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধনিক সমাজের ভাবধারা একেবারে লুপ্ত হইবে না। ধনিক সমাজের ধ্বংসাবশেষ বেশ কিছু থাকিয়া যাইবে। এমন অবস্থায় রাষ্ট্রযন্ত্রের উচ্ছেদ করা হইলে ধনিক সমাজ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে এবং সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা কোনও দিনই হইয়া উঠিবে না। সমাজতন্ত্র (সোশ্যালিজম্) হইতেছে ধনতন্ত্র (ক্যাপিটালিজম) এবং সাম্যবাদের (কমিউনিজম) মধ্যে একটি স্তর। ধনিক-ব্যবস্থা হইতে সাম্যবাদে পৌঁছাইতে হইলে, এই সোপান পার হইয়া যাইতে হইবে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাজ ধনতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ লুপ্ত করিয়া জনসাধারণকে সাম্যবাদী শিক্ষা ও ভাবধারায় দীক্ষিত করা এবং ক্রমে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করা; সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে কিছু কিছু জোর জুলুম চালাইতে হইবে সেই সকল লোকের উপর, যাহারা ধনিক সমাজের সমর্থক, যাহারা সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করিবে। সমাজতন্ত্রের রাষ্ট্রকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে হইবে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য; এমন আদর্শ সমাজ সৃষ্টি করিবার জন্য যেখানে আর রাষ্ট্র-যন্ত্রের প্রয়োজন থাকিবে না। যাঁহারা রাষ্ট্র ব্যবস্থা উচ্ছেদ করিয়া একবারেই

ধনতন্ত্র হইতে সাম্যবাদে লাফ দিবার চেষ্টা করিবেন, তাঁহাদের মনোভাব যতই মহৎ হউক না কেন, তাঁহারা কার্য্যবশতঃ ধনিক-ব্যবস্থাকে বাঁচাইয়া রাখিতেই সাহায্য করিবেন।

সমাজতন্ত্র কথাটার আজকাল বড়ই কদর্থ হইতেছে। পথে ঘাটে ইহা এখন প্রায় যে-কোনও অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সমাজের দশজনের প্রয়োজনে যে কোনও কাজকেই এখন অনেকে সমাজতন্ত্র বলিয়া চালাইয়া দেন। এইজন্য সমাজতন্ত্র কথাটা ব্যবহার করা বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃত সমাজ-তন্ত্রীদের এই সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত। তাঁহারা যেন শুধু নামের ফাঁকিতে না পড়েন। পূর্ব্বে সাম্যবাদীগণ নিজেদের অনেক সময়েই সমাজতন্ত্রী বলিয়াও আখ্যা দিতেন। কেননা, সমাজতন্ত্র সাম্যবাদে পৌঁছাইবার একটি স্তর বা সোপান। সমাজতন্ত্রের ভিতর দিয়া না গেলে সাম্যবাদে পৌঁছান অসম্ভব। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবে। কাজেই সমাজতন্ত্রীদিগকে সাম্যবাদী ভিন্ন অন্য কোনও মতাবলম্বী বলিয়া ভুল করিবার কোনও সঙ্গত কারণ ছিল না। কিন্তু পরেরযুগে নানা-জাতীয় সুবিধাবাদীদের অপপ্রয়োগে "সমাজতন্ত্র" শব্দটি ব্যবহার করা বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইল বলিয়া সাম্যবাদীগণ নিজেদের কমিউনিস্ট বা সাম্যবাদী বলিয়াই অভিহিত করেন এবং লেনিন সাম্যবাদীদের আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের নামকরণ করিলেন "কমিউনিস্ট ইণ্টার ন্যাশনাল" বা "সাম্যবাদী আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ।" লেনিন পার্টিকে সমাজতন্ত্রী পার্টি না বলিয়া সাম্যবাদী পার্টি বলিলেন কেন, সেই সম্বন্ধে যুক্তি দেখাইয়া বলিয়াছেন, "যদিও মানবসমাজ ধনতন্ত্রের পর সমাজতন্ত্রেই পৌঁছিবে, তবুও আমাদের পার্টির উদ্দেশ্য আরও অগ্রসর হওয়া এবং প্রকৃতপক্ষে সাম্যবাদই সমাজতন্ত্রের বাস্তব পরিণতি।"

রাষ্ট্রিক-সমাজতন্ত্র (স্টেট সোশ্যালিজম) নামে একটি কথা এখন বহুল-প্রচারিত। যে রাষ্ট্রে বিশিষ্ট উৎপাদনের উপায়গুলির, শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকানা স্বত্ব রাষ্ট্রের হাতে, সেখানে রাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্র প্রচলিত বলা হয়। কোনও একটি রাষ্ট্র হয়তো ডাক-বিভাগ, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, রেলওয়ে

স্টীমার প্রভৃতি যানবাহন-বিভাগ, খনি, লোহালক্কর অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা প্রভৃতি পরিচালিত করে। এ-ক্ষেত্রে বলা হয় যে, উক্ত রাষ্ট্রে রাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু, আমরা যেন রাষ্ট্রীক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে এক অর্থ জ্ঞাপক মনে করিয়া না বসি। সমস্ত কিছু উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক যদি রাষ্ট্র হয়, শুধু তাহা হইলেই রাষ্ট্রকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা চলে না। দেখিতে হইবে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কোন্ শ্রেণীর হাতে, রাষ্ট্র পরিচালনা করে কাহারা। রাষ্ট্র যদি ধনিক শ্রেণীর হাতে থাকে, তাহা হইলে সেখানে রাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও অর্থাৎ সমস্ত উৎপাদনের উপায়গুলি রাষ্ট্রের আয়ত্বাধীন থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনের উপায়গুলি ধনিক শ্রেণীরই থাকিয়া গেল, উহা ধনিকদের স্বার্থে ব্যবহৃত হইবে। রাষ্ট্র-যন্ত্র যতক্ষণ না শ্রমজীবীদের হাতে আসিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহার যত কিছু ব্যবস্থা, তাহা ধনিকেরই সুবিধার জন্য, এবং সকল ব্যবস্থাই ধনিকপ্রথার অন্তর্গত হইবে (প্রকৃতপক্ষে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রগুলির অবস্থা অনেকটা এইরূপ)। রাষ্ট্রিক সমাজতন্ত্র একটি ভূয়া কথা, ইহা জনসাধারণকে ধাপ্পা দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়; ইহাকে রাষ্ট্রিক ধনতন্ত্র (স্টেট ক্যাপিটালিজম্) বলিলেই ঠিক হইত। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রকেই বলা হয় যে রাষ্ট্র শুধু সমাজের উৎপাদনের উপায়গুলিরই মালিক নয়, যে রাষ্ট্র পরিচালনা করে সমাজের সমস্ত শ্রমজীবীগণ। ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র উভয়েই সমাজের সকল উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক; এইজন্য অনেকে ইহাদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না এবং কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন লোকেরা সাধারণকে ভুল বুঝাইবার সুযোগ পায়। এই দুইটী রাষ্ট্রের মধ্যে মূল পার্থক্য এই যে, একটি রাষ্ট্রের মালিক হইল ধনিক শ্রেণী এবং অন্যটির মালিক সমস্ত শ্রমজীবীগণ।

ধনিক সমাজে কাজ করিবার, উন্নতি ও সৃষ্টি করিবার প্রেরণা যোগায় মুনাফা ভোগ করিবার আশা ও সম্ভাবনা। সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজে মুনাফা ভোগ করিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। সেখানে কর্ম্মপ্রেরণা যোগাইবে কিসে?—এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই আমাদের মনে জাগে। অর্থ জমা

করিবার কিংবা অন্যকে শোষণ করিবার প্রবৃত্তি মানুষের জন্মগত নয়। বহুদিন যাবৎ শোষণ প্রথা চলিয়া আসার ফলেই মানুষের এই প্রবৃত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। বসিয়া খাইবার ইচ্ছা এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা—বার্দ্ধক্য, রোগ, শোক, ছেলেপিলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা—এইগুলিই মানুষকে অর্থগৃধ্নু শোষক করিয়া তুলিয়াছে। যে সমাজে বসিয়া খাওয়া শুধু আইন-বিরুদ্ধই নয়, নূতন ভাবধারা প্রচারের ফলে সমাজের সকলের চক্ষুতে ঘৃণ্য এবং অপমান-জনকও বটে এবং যে সমাজে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও কোন অনিশ্চয়তা নাই, সমাজই সকলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছে এবং সেই দায়িত্ব খুব ভাল ভাবেই পালন করে,—বার্দ্ধক্য, রোগ, শোক, ছেলেপিলের সুশিক্ষা ও সু-প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্বন্ধে কোনও দুর্ভাবনা ভাবিতে হয় না—সেই সমাজে শোষণ করিবার প্রবৃত্তিও ক্রমে লোপ পাইবে। পরিশ্রম করিলে, উন্নতি করিলে নূতন কিছু সৃষ্টি করিলে সমাজের সকলের সুখ সমৃদ্ধি বাড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও সুখ সম্ভোগ, সুযোগ সুবিধা বাড়িয়া যাইবে—এই সামাজিক চেতনা ও দায়িত্ববোধই মানুষকে করিয়া তুলিবে অক্লান্তকর্ম্মী। সমস্ত সমাজ ও জন-গণ কর্তৃক পুরস্কৃত হইবার, সম্মানিত হইবার, আদর পাইবার প্রবল আশা আকাঙ্খা ও মানুষের জীবনকে কর্ম্মময় ও নূতন সৃষ্টি করিবার আগ্রহে আকুল করিয়া তুলিবে। বস্তুতঃ, যাহারা ধনিক সমাজে শিল্প-কলা, সাহিত্য-বিজ্ঞান প্রভৃতি সৃষ্টি করে তাহাদের কত সামান্যই না সুযোগ সুবিধা, আর কতটুকুই বা আদর! কিন্তু সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী সমাজে সমস্ত সমাজ হইবে তাহাদের সমঝদার, তাহারা হইবে সকলের সম্মানীয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের দিকে নজর দিলেই আমরা এই কথার সার্থকতা বুঝিতে পারি।

একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে সকলে সমান ভাবে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা পাইবে। ফলে সকল লোকই যখন উন্নত এবং কোনও না কোন প্রয়োজনীয় শিক্ষায় পারদর্শী হইয়া উঠিবে, তখন নিকৃষ্ট এবং ঘৃণ্য কাজগুলি করিতে রাজী হইবে কাহারা? আর, সমাজতান্ত্রিক সমাজে যদিও বা অধিকতর উপার্জ্জনের লোভে কেহ ঘৃণ্য কাজ করিতে রাজী হয়, কিন্তু

সাম্যবাদী সমাজে যখন সকলেই প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগের অধিকার পাইবে, তখন ঘৃণ্য কাজ করিতে লোকে রাজী হইবে কেন? সমাজ-সেবার মনোভাব হইতে কয়জন লোক আপনা-আপনি এইরূপ কাজ করিতে অগ্রসর হইবে?

বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, সেইদিকে একটু লক্ষ্য করিলেই আমরা উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব পাইতে পারি। বিজ্ঞানের যে পর্য্যন্ত উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব্ব যুগের অনেক ঘৃণ্য কাজই এখন আর ঘৃণ্য পর্য্যায়ে পড়ে না; যেমন, মুচী, মেথর, ঝাড়ুদার, ভিস্তিওয়ালা প্রভৃতি কাজ এখন উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রথার সাহায্যে ভদ্রভাবেই করা চলে। বাষ্পীয় শক্তি, বিদ্যুৎ, উন্নত যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইবার ফলে এখন এই সকল কাজ হইয়াছে নিপুণ কারিকর ও ভদ্র বৈজ্ঞানিকের কাজ। চাষ করা, মাটি কাটা প্রভৃতি যে সকল কাজ অসম্ভব শারীরিক শ্রমসাধ্য ও নিকৃষ্ট ছিল, এখন বিজ্ঞান সেইগুলিকে দক্ষ যান্ত্রিকের কাজে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু ধনিক সমাজে সমস্ত উৎপাদনের উদ্দেশ্য মুনাফা সৃষ্টি করা, সেই জন্য এই সকল আবিষ্কারের উপযুক্ত ব্যবহার হইতে পারে না। কেন না, এইগুলি ব্যবহার করিলে অনেক সময়েই খরচ বেশী পড়ে, মুনাফা কম হয় এবং কোনও কোনও কাজে হয়তো মুনাফা থাকেই না। আর, আর্থিক অনটনের জন্য সাধারণ লোক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত, ইহার সুযোগ গ্রহণ করা তাহাদের সামর্থ্যের অতীত। এই সকল কারণে, জনসাধারণের পক্ষে হিতকর ও কষ্টলাঘবকারী যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আবিষ্কারের দিকে বৈজ্ঞানিকেরা বড় বিশেষ নজর দেন না—তাহাদের তো খাওয়ার যোগাড় করিতে হইবে, এইরূপ কাজ করিলে তাহাদের আদর করিবে কে? ইহার চাইতে বরং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্য ধ্বংসকারী মারণাস্ত্র আবিষ্কার করা অনেক বেশী লাভজনক। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজে যখন লাভের প্রশ্ন থাকিবে না সমাজের সকলের ভোগের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন হইবে, তখন সকল বৈজ্ঞানিকের আদর্শ এবং স্বার্থ ই হইবে জনহিতকর নূতন নূতন আবিষ্কার করা। ফলে এই জাতীয় আবিষ্কারের সংখ্যা তখন সহস্রগুণ বৃদ্ধি

পাইবে এবং বর্ত্তমান যুগে পর্য্যন্ত যে সকল কাজ নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য উপায় ভিন্ন সমাধা করা চলে না, সেইগুলিও আর নিকৃষ্ট এবং ঘৃণ্য থাকিবে না এবং প্রকৃতপক্ষে যতক্ষণ না সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিজ্ঞানের ক্রমাগত দ্রুত উন্নতির ফলে সমস্ত কাজই হইয়া পড়িতেছে সহজ, সরল, ভদ্রোচিত এবং নিরাপদ—যাহাতে সকল লোকই অল্প আয়াসে সকল কাজ ভালভাবে করিতে পারে—ততক্ষণ পর্য্যন্ত সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; সাম্যবাদ আসিবে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্যের ফল স্বরূপ।

প্রশ্নমালা

১। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও সাম্যবাদী সমাজের মধ্যে প্রভেদ কি?

২। ধনিক ব্যবস্থার পরেই কি সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করা চলে না? কারণ দেখাইয়া উত্তর দাও।

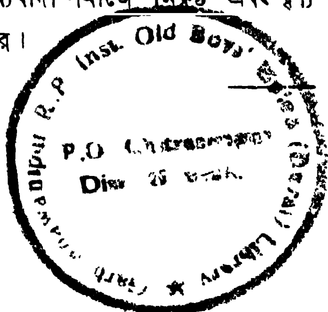
৩। সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্র লোপ পাইবে কি ভাবে?

৪। রাষ্ট্র সম্বন্ধে নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে সাম্যবাদীদের মতের পার্থক্য কোথায়? নৈরাজ্যবাদীদিগকে কল্পনা-বিলাসী বলা হয় কেন?

৫। রাষ্ট্রিক-সমাজতন্ত্র কি? সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রিক-সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সাধারণ লোক ভুল করে কেন? ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়, মূল পার্থক্যই বা কি?

৬। সাম্যবাদী সমাজে উৎপাদন করিবার প্রেরণা যোগাইবে কিসে?

৭। সাম্যবাদী সমাজে নিকৃষ্ট এবং ঘৃণ্য কাজ করিবে কাহারা? বিশদ আলোচনা কর।



নয়

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার দায়িত্ব মানক শ্রেণীর এবং ধনিকদের বিপ্লবের ভিতর দিয়া এই কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদ শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শ, ইহার ভিতর দিয়া সমস্ত শ্রমজীবীদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত হইবে। কাজেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সুসম্পন্ন করিবার দায়িত্ব শ্রমিক শ্রেণীর। শ্রমিক শ্রেণীই এই বিপ্লবে নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ফলে নিপীড়িত ও নির্য্যাতিত সকলে এই বিপ্লবে যোগদান করিবে। এইজন্য, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আর এক নাম শ্রমিক বা সর্ব্বহারা বিপ্লব। প্রশ্ন হইতে পারে যে, একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীই সমাজতান্ত্রিক-বিপ্লবে নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার উপযোগী কেন এবং কেনই বা অন্যান্য নিপীড়িত শ্রেণীগুলি এই বিপ্লবে নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার উপযোগী নয়? সমাজতন্ত্রবাদ-সাম্যবাদ শ্রমিক শ্রেণীর দর্শন ও আদর্শ। এই কথা সত্য যে, সমাজতন্ত্রবাদ-সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে সমাজে সকল নিপীড়িতদেরই লাভ। যাহারা সামাজিক উৎপাদনে পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহাদের সকলেরই ইহাতে স্বার্থ। কিন্তু একটি সম্পূর্ণ শ্রেণী হিসাবে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীরই ইহা দাবী। অন্যান্য নির্য্যাতিতদের কাহারও কাহারও স্বার্থ ধনতন্ত্রের ভিতর দিয়াও প্রতিষ্ঠিত এবং রক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু একমাত্র সমাজতন্ত্রবাদ-সাম্যবাদের ভিতর দিয়াই শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহাদের সমস্যা সমাধানের অন্য কোন উপায়ই নাই। শ্রমিকশ্রেণী একটি ফাটলহীন অবিভাজ্য শ্রেণী, কিন্তু অন্যান্য নিপীড়িত শ্রেণীগুলি এইরূপ নয়। তাহাদের

মধ্যে পরস্পর স্বার্থের সংঘাত রহিয়া গিয়াছে, একজনের ক্ষতি করিয়া অন্যের সুবিধা হইতে পারে, একজনকে শোষণ করিয়া অন্য একজন ধনী হইতে পারে। শ্রমিকশ্রেণীর ভিতরে এইরূপ ঘটিবার কোন প্রকার সম্ভাবনাই নাই। এইজন্য, যদিও সমাজতন্ত্রবাদ-সাম্যবাদে সমস্ত নিপীড়িতদেরই লাভ, তবু শ্রমিক ভিন্ন অন্যান্য নিপীড়িতদের দাবী সমাজতন্ত্রবাদ-সাম্যবাদ নয়। ধনতন্ত্র বজায় রাখিয়াই তাহারা এমন অবস্থা চাহে, যাহাতে তাহাদের সুখ সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু ইহার ফলে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হউক তাহা তাহারা চাহে না।

শ্রমিকশ্রেণী খুব বেশী সংখ্যায় দলবদ্ধভাবে বাস করে। তাহাদের জীবন সৈনিক-জীবনের মত শৃঙ্খলাবদ্ধ। কলকারখানা প্রভৃতিতে তাহারা যে প্রকার কাজ করে, সেই কাজের সুবিধার জন্য মালিক তাহাদিগকে একত্রিত করিতে বাধ্য হয় এবং তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইবার সুযোগ পায়; আর কল-কারখানার শৃঙ্খলানুযায়ী জীবনযাপন তাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। এতদ্ব্যতীত ধনতন্ত্রের যেখানে ঘাঁটি, (যেমন বড় বড় সহর বন্দর প্রভৃতি), শ্রমিকশ্রেণীও সেই সেই জায়গাতেই সব চাইতে বেশী শক্তিশালী; কলকারখানাই ধনতন্ত্রের ভিত্তি, আবার কলকারখানাতেই শ্রমিকশ্রেণীর জোর বেশী। উপরোক্ত কারণগুলির জন্যই শ্রমিকশ্রেণী ধনতন্ত্রকে ঘায়েল করিবার পক্ষে সব চাইতে বেশী উপযোগী, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার উপযুক্ত। অন্যান্য নির্য্যাতিতগণও তাহাদের স্ব স্ব স্বার্থে বিপ্লবে যোগদান করিবে এবং শ্রমিক শ্রেণী তাহাদের সকলের সম্মুখভাগে থাকিয়া তাহাদিগকে বিপ্লবে পরিচালিত করিবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকশ্রেণী হইল বর্শার ফলা। পিছনে অন্য শক্তির জোরে ইহাই ধনতন্ত্রকে মরণ আঘাত হানিবে। কিন্তু এই বিপ্লব সমাধা করিবার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর একটি জোরাল যন্ত্র বা অস্ত্রের প্রয়োজন।

যে যন্ত্রের সাহায্যে ধনিক প্রথা ধ্বংস করিয়া শ্রমজীবীগণ সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবে, তাহার নাম কমিউনিস্ট বা সাম্যবাদী পার্টি।

পুরাতন প্রতিক্রিয়াশীল ধনিক-সমাজ ধ্বংস করিয়া শ্রমিক বিপ্লবকে জয়যুক্ত করিবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর হাতিয়ার এবং ইহারই সাহায্যে নূতন সমাজতন্ত্রী সমাজ ও সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ধনিক শ্রেণীর হাত হইতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিনাইয়া নিবার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে যেমন কমিউনিস্টপার্টি একান্ত প্রয়োজনীয়, তেমন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করিবার পর সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যও ইহা অপরিহার্য্য। পার্টির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লেনিন বলিয়াছেন, "সর্ব্বহারার এক-নায়কত্ব (প্রলেটারিয়েন ডিক্‌টেটরসিপ) এক অতি কঠিন সংগ্রাম। ইহাকে যে শুধু পুরাতন সমাজের (ধনিক সমাজের) সৈন্য সামন্তের সঙ্গে লড়িতে হয় তাহা নহে, পুরাতন সমাজের রীতিনীতি, সংস্কার প্রভৃতির বিরুদ্ধেও ইহাকে সংগ্রাম করিতে হয়। এই সংগ্রাম হিংস ও অহিংস দুই-ই, ইহাতে রক্তপাত করিতেও হয় আবার সময়ে রক্তপাতের কোন আবশ্যকও হয় না; ইহা সামরিক ও অর্থ নৈতিক, শাসন-সংক্রান্ত ও শিক্ষাবিষয়ক সংগ্রাম। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের মধ্যে যে পুরাতন অভ্যাস মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে, তাহার শক্তি নেহাৎ কম নহে। এই শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভ করা একেবারে অসম্ভব, যদি না এমন একটি পার্টি থাকে, যে পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর সকলের বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছে। এই পার্টিকে জনগণের মনোভাব বুঝিতে হইবে এবং তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইতে হইবে।" অন্যত্র লেনিন বলিয়াছেন, "পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর সেনাপতিমণ্ডলী", "পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী।" সেনাপতিমণ্ডলী ভিন্ন যেমন যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না, তেমন পার্টি ভিন্ন শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবে জয়লাভ করিতে পারে না; সৈন্য-বাহিনীতে সেনাপতিমণ্ডলীর যাহা কাজ, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে পার্টির তাহাই কাজ। যুদ্ধের সময়ে অগ্রগামী বাহিনী যেমন সমগ্র সৈন্যবাহিনীর কিছু আগে আগে থাকিয়া বাহিনীকে পরিচালিত করে, পার্টিও সেইরূপ সমস্ত শ্রেণীকে পরিচালিত করে। এই অগ্রগামী দল যদি অন্যের চাইতে খুব বেশী আগাইয়া পড়ে (যাহাতে তাহাদের আর অনুসরণ করা চলে না), তাহা

হইলেও যেমন বিপদ, তেমনি ইহা সর্ব্বসাধারণের পিছনে পিছনে চলিলেও বিপদ। ইহার কোনটাতেই বিপ্লবের কাজ ঠিকমত অগ্রসর হইতে পারে না। অগ্রগামী দলের কাজ জনগণকে ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া নয়, তাহাদের সকলকে বিপ্লবের দিকে আগাইয়া নিয়া চলা।

কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব পার্টি। শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন সাম্যবাদ ইহার ভিত্তি এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আদর্শ সমাজতন্ত্রবাদ-সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করা ইহার আদর্শ। যাঁহারা শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন বা আদর্শে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে বলা হয় সাম্যবাদী বা কমিউনিস্ট। যে সকল সাম্যবাদীগণ কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ম শৃঙ্খলা মানিয়া পার্টির নির্দ্দেশ অনুযায়ী অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, একমাত্র তাঁহারাই কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হইবার উপযুক্ত। লেনিনের ভাষায় যাহারা "পেশাদার বিপ্লবী" (Professional Revolutionaries) অর্থাৎ শ্রমিক বিপ্লবের জন্য কাজ করাই যাহাদের একমাত্র পেশা, শুধু সেইরূপ বিপ্লবীই কমিউনিস্ট পার্টিতে স্থান পাইবে। পার্টির কাজই সভ্যের কাজ, সভ্যকে সব সময়েই পার্টির কাজ অর্থাৎ বিপ্লবের কাজ করিতে হইবে, তাহার অন্য কোনও কাজ থাকিতে পারে না, যদি না পার্টি সেইরূপ নির্দ্দেশ দেয়। পার্টি-সভ্যের জীবনে অন্যান্য সকল কাজই অপ্রধান, বিপ্লবের কাজই মুখ্য কাজ, পার্টি তথা বিপ্লবের কাজে পার্টি-সভ্যকে অন্যান্য সব কিছু ত্যাগ করিতে হইবে, বিপ্লবীর জীবন পার্টি-জীবন; পার্টি হইতে স্বতন্ত্র ভাবে তাহার কোনও অস্তিত্ব নাই, বিপ্লবের পক্ষে অশুভ কোন কাজই সে করিতে পারে না।

সমস্ত শ্রমিকই কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হইতে পারে না; কেন না সকলেই শ্রেণী-স্বার্থ-সম্বন্ধে সচেতন শ্রমিক নয়, বিপ্লবের কাজকে জীবনের মুখ্য কাজ বলিয়া সকলে গ্রহণ করিতে পারে না। শ্রেণী-স্বার্থ-সচেতন শ্রমিকগণ তাহাদের জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া তাহাদের শ্রেণী-স্বার্থ, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়াছে। তাহাদের সমস্ত কিছু অভাব অভিযোগ, দুঃখ দারিদ্রের গোড়ার কারণ হইল ধনিক-ব্যবস্থা, এবং ধনিক সমাজকে ধ্বংস করিয়া যতদিন পর্য্যন্ত না সমাজতান্ত্রিক

সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা যাইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের দুঃখকষ্টের লাঘব হইতে পারে না। শুধু তাহাই নহে, ধনিক-সমাজের মধ্যে অগণিত জনগণকে যে দুঃসহ লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন সহ্য করিতে হয় তাহা চিরতরে দূর করিবার জন্য সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করা দরকার, নতুবা জনগণের পক্ষে কোনও রকমে দিন গুজরান, জীবন রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। ধনিক-ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিবার একমাত্র উপায় দরিদ্র ও নিপীড়িত জনগণের বিপ্লবী আন্দোলন। সর্ব্বহারা বিপ্লবের ভিতর দিয়া ধনিকরাষ্ট্র ধ্বংস হইবে এবং জনগণের নিজস্ব রাষ্ট্র সর্ব্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে—যাহারা শ্রেণী সচেতন, উপরের সাম্যবাদী মতে বিশ্বাসী এবং সর্ব্বহারা বিপ্লবকে জয়যুক্ত করিবার জন্য সর্ব্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করিবার জন্য পার্টির নির্দ্দেশ অনুযায়ী অক্লান্ত পরিশ্রম করিবে, একমাত্র সেই সকল শ্রমিকই কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হইবে। শ্রমিকদের মধ্যে যাহারা নেতৃস্থানীয়, অধিকাংশ শ্রমিকই যাহাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে এবং শ্রমিকশ্রেণীর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমের ভিতর দিয়া যাহারা সকল শ্রমিকের বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছে, শুধু তাহারাই হইবে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। মোট কথা, প্রত্যেক সাম্যবাদীই হইল এক একজন বিপ্লবী নেতা, বিপ্লবী জনগণকে পরিচালনা করিবার মত ক্ষমতা ও চেতনা তাহার আছে এবং তাহার নির্দ্দেশ বহুলোক মানিয়া চলে। এইভাবে, যদিও কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য-সংখ্যা খুব বেশী হয় না, তবু সভ্যদের কাজের ভিতর দিয়া কমিউনিস্ট পার্টি সকল বিপ্লবী জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের সমুদয় অংশসমূহের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। পার্টি-মারফত সমস্ত বিপ্লবী জনগণ কমিউনিস্ট পার্টির নির্দ্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হয়, জনগণ কমিউনিস্ট পার্টিকে নিজেদের পার্টি বলিয়া বুঝিতে পারে এবং বিশ্বাস করে যে পার্টির নির্দ্দেশ মত চলিলে তাহাদের সমস্ত অভাব অভিযোগ দূর হইবে। অগণিত বিপ্লবী জনগণের সঙ্গে পার্টির বিপ্লবী সম্বন্ধ স্থাপিত হয় পার্টিসভ্যদের মারফত, পার্টি হইয়া পড়ে সমুদয় বিপ্লবী জনগণের পার্টি। বিপ্লবী

জনগণের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগের ভিতর দিয়া (সমাজ ও সকলকে বাদ দিয়া মানুষ শুধু নিজের স্বার্থই দেখিলে তাহাকে ক্ষুদ্র স্বার্থ বলা হয়, কেননা শেষ পর্য্যন্ত ইহাতে নিজেরও মঙ্গল হয় না) পার্টির সভ্যগণ জনগণের যে অগাধ বিশ্বাসের অধিকারী হয় এবং এইভাবে পার্টিকে জনপ্রিয় করিয়া তোলে, সেই বিশ্বাস ও জনপ্রিয়তাই পার্টির শক্তি।

সাম্যবাদী নেতাকে বলা যাইতে পারে শ্রমিকশ্রেণীর নেতা, কারণ সাম্যবাদ শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শ। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর নেতাকে শুধু শ্রমিকদের নেতা হইলেই চলিবে না, কেননা শুধুমাত্র শ্রমিকদের চেষ্টা বা বিপ্লবী আন্দোলনের ভিতর দিয়াই সমাজতন্ত্রবাদ-সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে না। সমস্ত জনগণ, ধনিক সমাজে যাহারা নিঃস্ব ও নিপীড়িত এবং ধনিকদের দ্বারা যাহারা শোষিত —তাহাদের সকলেরই স্বার্থ রহিয়া গিয়াছে সমাজতন্ত্রবাদ-সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করায়। সর্ব্বহারা বিপ্লব সমস্ত শোষিত জনগণের বিপ্লব। সমস্ত শোষিত জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনের ভিতর দিয়াই শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবে। সুতরাং, প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর নেতা, শুধুমাত্র শ্রমিকদেরই নেতা নয়, সমগ্র বিপ্লবী জনগণেরও নেতা। শ্রমিকশ্রেণীর নেতাকে সমগ্র বিপ্লবী জনগণের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে হইবে, বিপ্লবী জনগণের নেতা হইতে হইবে; নতুবা শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শ সমাজতন্ত্রবাদ-সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর হইবে না।

সমাজতন্ত্রবাদ-সাম্যবাদ শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শ, কাজেই ইহা স্বাভাবিক যে শ্রমিকদের মধ্য হইতেই কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হইবে বেশী। কিন্তু শ্রমিক ভিন্ন অন্যান্য যাহাদের স্বার্থ রহিয়া গিয়াছে সমাজতন্ত্রবাদ-সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করায় (যেমন কৃষক, মধ্যবিত্ত প্রভৃতি), এমন লোকদের মধ্য হইতেও কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হইবে, এমন কি যে ধনিকশ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের বিরোধী, তাহাদের মধ্য হইতেও কেহ কেহ সাম্যবাদী হইতে পারে; কেননা, যাহারা সমাজের বৈজ্ঞানিক গতি বুঝিতে পারিবে, যাহারা নিজেদের বৈজ্ঞানিক চিন্তাশক্তি দ্বারা বুঝিতে পারিবে যে ধনিক সমাজের গলদগুলি দূর করিয়া

সমাজকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে সমাজতন্ত্রবাদ-সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই, বিপ্লবী চিন্তাধারার ফলে তাহাদের মধ্যে অনেকে নিজেদের ক্ষুদ্র শ্রেণীস্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া জনগণের স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থ মিলাইয়া লইতে পারে এবং শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শ গ্রহণ করিয়া সাম্যবাদীতে পরিণত হইতে পারে। শ্রমিক ভিন্ন অন্যান্য যাহারা নিজেদের বিপ্লবী চিন্তা-ধারার ফলে সর্ব্বহারার স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থ মিলাইয়া নেয়, যাহারা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আদর্শ গ্রহণ করে এবং সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহাদিগকে বলা হয়, "স্বশ্রেণীত্যাগী সর্ব্বহারা" (Declassed Proletariat)।

কমিউনিস্ট বা সাম্যবাদী পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি। সাম্যবাদী পার্টি ভিন্ন শ্রমিকশ্রেণীর অন্য কোনও বিপ্লবী পার্টি থাকিতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ধনিকদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আছে, এমন কি এক দেশের ধনিকদেরও ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে, যদিও ধনিক সমাজ বজায় রাখা সমস্ত ধনিকশ্রেণীরই স্বার্থ, তবু ব্যবসায় প্রভৃতিতে জোর প্রতিযোগীতার ফলে ধনিকদের মধ্যে দলগত বিভেদ আছে। এক দেশের মধ্যে যতই দলগত স্বার্থের বিরোধ থাকুক না কেন, তাহাদের সকলের সাধারণ স্বার্থ এক, ধনতন্ত্র বজায় রাখা ও প্রসার করা। এই সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্যই তাহাদের রাষ্ট্র। ধনিকরাষ্ট্র ধনিকদের দলগত স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তাহাদের সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করে। এক দেশের ধনিকদের সঙ্গে অন্য দেশের ধনিকদের ব্যবসাগত স্বার্থের সংঘাত, এক শিল্পের ধনিকদের সঙ্গে অন্য শিল্পের ধনিকদের প্রতিযোগীতা প্রভৃতি কারণে একদল ধনিকদের ক্ষতি না করিয়া অন্য একদল ধনিক বড় হইতে পারে না। এক দেশের ধনিকদের কাবু করিতে না পারিলে অন্য দেশের ধনিকদের পক্ষে অধিকতর লাভবান হওয়া চলে না (ইহাই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কারণ)। এই জন্যই ধনিকদের বিভিন্ন দলগত স্বার্থ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক পার্টি থাকে। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ সর্ব্বত্র সকলের জন্যই এক। শ্রমিকদের

মধ্যে স্বার্থগত সংঘাত নাই, ধনিক সমাজ ধ্বংস করিয়া শ্রমিকরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সকল দেশের সকল শ্রমিকদের বিপ্লবী স্বার্থ এবং শ্রমিকরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও সমস্ত শ্রমিকের স্বার্থ একই থাকে, কেন না ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শ্রমিকদের উন্নতি হইতে পারে না। ঠিক যেমন একটা কাপড়ের মিলে সমস্ত তাঁতীর আয় না বাড়াইলে একজন তাঁতীর আয় স্বতন্ত্রভাবে বাড়িতে পারে না, সেইরূপ সমস্ত সমাজের উন্নতি হইলেই সকলের উন্নতি, একজনকে শোষণ করিয়া বা ঠকাইয়া অন্যের বড় হইবার উপায় নাই, সকলের চেষ্টার ফলে সমস্ত সমাজের উন্নতি হইবে। সুতরাং যেখানে স্বার্থের সংঘাত নাই, যেখানে সকলের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য এক, সেখানে রাজনৈতিক পার্টিও শুধু একটাই থাকিতে পারে; ভিন্ন স্বার্থ থাকিলেই শুধু ভিন্ন দল দাঁড়ান সম্ভবপর। এইজন্য, দুনিয়ার সর্ব্বত্র শ্রমিকশ্রেণীর একটাই পার্টি। ধনিকগণ যেমন তাহাদের রাষ্ট্রের সাহায্যে তাহাদের সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করে, শ্রমিকগণ সেইরূপ তাহাদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের রাজনৈতিক পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি গড়িয়া তোলে। শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জ্জাতিক পার্টির নাম কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল বা সাম্যবাদী আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘ। ইহাকে সচরাচর তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিক বলা হয়, কারণ ইহার পূর্ব্বে মার্কস্ ও এঙ্গেলস্-এর চেষ্টায় ১৮৬৪ সালে একবার ও পরে ১৮৮৮ সালে আর একবার, এই দুইবার দুইটি আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল। প্রথম আন্তর্জ্জাতিকের অস্তিত্ব লোপ পাইবার পরে দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক গঠিত হয়। ১৮৯৫ সালে এঙ্গেলস্-এর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক ক্রমে প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া পড়ে এবং ইহা এখন ধনিক শ্রেণীর লেজুড়ের সঙ্ঘে পরিণত হইয়াছে। তাই, রুশ বিপ্লবকে জয়যুক্ত করিয়া সোভিয়েট গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার পর ১৯১৯ সালে লেনিন তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠিত করেন। তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিকের প্রধান কার্য্যালয় সোভিয়েট ইউনিয়ানে অবস্থিত, কারণ দুনিয়ার অন্য সকল জায়গাতেই ধনিকদের প্রভাব এবং ধনিকগণ সাম্যবাদীদের আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান সহ্য করিতে রাজী নয়, কারণ ইহা হইল ধনিকশ্রেণীর মৃত্যু-বাণ। বর্ত্তমানে তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিকের

শাখা কমিউনিস্ট বা সাম্যবাদী পার্টি তুনিয়ার প্রায় সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (যদিও এখন অনেক জায়গাতে ইহা বে-আইনী এবং তাই গোপন কাজ চালায়) এবং এই *পার্টিগুলি হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিকের কার্য্যকরী পরিষদ গঠিত। তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিক ভিন্ন ভিন্ন দেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া তুনিয়ার সর্ব্বত্র বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করিত। যে-হেতু রুশদেশে তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিকের প্রধান কার্য্যালয় অবস্থিত, সেইজন্য অনেক স্বার্থান্বেষী প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিককে রুশদেশের জনগণের আওতায় তাহাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির একটি যন্ত্র বলিয়া প্রচার করে। বর্ত্তমানে অবশ্য এই সজ্ঘ আর নাই। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর মনে এইরূপ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না, কেননা তাহারা জানে যে তুনিয়ায় সর্ব্বত্র শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ এক, ধর্ম্মগত বা জাতিগত পার্থক্যের কথা স্বার্থান্বেষী ধনিক-স্বার্থকামীরাই প্রচার করে, শ্রমিকরা শুধু শ্রেণীগত পার্থক্যই জানে। ইংলণ্ডের জনগণের যাহা স্বার্থ ভারতের জনগণেরও তাহাই; ইংলণ্ডে ধনিক প্রথা ধ্বংস করিলে যেমন সেখানকার জনগণের মুক্তি, ভারতের জনগণেরও ঠিক তেমনি; এবং ইহার উল্টাটাও সমভাবে সত্য। এইরূপে, তুনিয়ার ধনিকদের যাহাতে ক্ষতি, তুনিয়ার শ্রমজীবীদের তাহাতেই লাভ। রুশদেশের জনগণের স্বার্থ অন্যান্য দেশের জনগণের স্বার্থ হইতে স্বতন্ত্র নয়। যতদিন পর্য্যন্ত তুনিয়ার সর্ব্বত্র বিপ্লবী আন্দোলন জয়যুক্ত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত রুশদেশেও পূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সেই জন্যই দেখি সোভিয়েট ইউনিয়ান সর্ব্বত্র বিপ্লবী আন্দোলনকে সাহায্য করে। আর, সোভিয়েট ইউনিয়ান যতই জোরদার ও শক্তিশালী হইবে, তুনিয়ার নিপীড়িত জনগণের ততই মঙ্গল।

প্রশ্নমালা

১। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির প্রয়োজনীয়তা কি?

২। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির নাম কি? কেন?

৩। ধনিকশ্রেণীর মত শ্রমিকশ্রেণীরও কি ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক পার্টি থাকিতে পারে না? কেন?

৪। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধে কি জান? তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিকের অন্য নাম কি?

৫। "পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর সেনাপতি-মণ্ডলী"; "পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী দল"—এই কথা দুইটির তাৎপর্য্য বুঝাও।

৬। কিরূপ লোক কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হইতে পারে? ধনিকশ্রেণী হইতে কেহ কি কমিউনিস্ট পার্টিতে আসিতে পারে? কি ভাবে? পার্টির আদর্শে বিশ্বাস করিয়া পার্টিকে শুধু অর্থ সাহায্য করিলেই কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হওয়া যায় না কেন? ইহাতে কি পার্টি ছোট হইয়া পড়ে না এবং পার্টি দুর্ব্বল হয় না? "পেশাদার-বিপ্লবী" কেন?

৭। শ্রমিকনেতা এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতার মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

৮। "কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবী নেতাদের পার্টি"—ইহা বলিতে কি বোঝায়?

৯। দুনিয়ার সর্ব্বত্রই শ্রমিকদের স্বার্থ এক—ইহা কি কার্য্যতঃ সত্য? উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

১০। শ্রমিকশ্রেণী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার উপযুক্ত কেন?

দশ

আমরা বলিয়াছি, কমিউনিস্ট পার্টির বেশীর ভাগ সভ্য হইবে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য হইতে। যাহারা সচেতন শ্রমিক তাহারা হইবে ইহার সভ্য, তদ্ভিন্ন অন্যান্য শ্রেণী হইতেও কিছু কিছু লোক "স্বশ্রেণীত্যাগী সর্ব্বহারায়" পরিণত হইয়া কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিবে। শ্রমিকদের শ্রেণীগত স্বার্থ হইতেছে সমাজতন্ত্রবাদ-সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করায়, কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীর তাহা নহে। শ্রমিকরা সকলেই মনে মনে সমাজতন্ত্রী, নেহাৎ যে অচেতন শ্রমিক, তাহাকেও যদি জিজ্ঞাসা করা হয় "তুমি কি পাইলে তৃপ্ত হও," তাহা হইলে সে উত্তর দিবে অনেকটা এইরূপ—"আমরা মেহনত করিয়া রক্ত জল করি আর মুনাফা নেয় সব মালিক; যদি কোম্পানীর যাহা মুনাফা হয় তাহা আমরা পাই তাহা হইলে আমাদের কোন অভাব থাকে না।" হয়ত কাহারও কাহারও উত্তর ইহা হইতে একটু গরম হইতে পারে, কাহারও বা একটু নরম হইতে পারে; কিন্তু এই কথা নিশ্চিত যে সকলের উত্তরের মধ্যেই আমরা সমাজতন্ত্রের একটা আভাস পাইব। প্রথমতঃ শ্রমিক শুধু ভিন্ন ভাবে তাহার একার মঙ্গলের কথা ভাবিতেই পারে না; প্রশ্ন যদি হয় "তুমি", উত্তর আসিবে "আমরা"। দ্বিতীয়তঃ, উত্তরের মধ্যে এমন একটা ভাব প্রকাশ পাইবে যে মালিকরা যাহা লাভ নেয় তাহা যেন অন্যায়, যাহা কিছু উৎপাদন হয় তাহা ভোগ করিবার অধিকার যেন শ্রমিকদেরই এবং ইহা ভোগ করিতে পারিলে যেন তাহাদের কোন অভাব অভিযোগই থাকিত না। কোনও শ্রমিকের মনে এই চিন্তা মোটেই আসে না—"ফ্যাক্টরীটা যদি আমার হয়, আমি যদি এতগুলি লোককে

খাটাইতে পারি তাহা হইলে কত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে পারিব"! শ্রমিকদের বাস্তব জীবন শ্রমিক-শ্রেণীকে সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী করে। বাস্তবিক পক্ষে সমাজতন্ত্র ভিন্ন শ্রমিকদের মুক্তির আর কোনও দ্বিতীয় পথ নাই। শ্রমিকরা গরীব, শুধু এই জন্যই যে তাহারা সমাজতন্ত্রের সব চাইতে শক্ত ভিত্তি তাহা নয়, আজীবন কাজ করিতে করিতে কাজ করিবার দিকে স্বাভাবিক ঝোঁক এবং বহুলোকের একত্রে সামাজিক ভাবে উৎপাদনে অংশ গ্রহণ, সামাজিক জীবনযাপন ও দ্রুত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তাহাদিগকে সমাজতন্ত্রের সমর্থক ও বিপ্লবী করিয়া তুলিয়াছে। (ভিক্ষুকরা শ্রমিকদের চাইতে অনেক গরীব, কিন্তু সামাজিক উৎপাদনে অংশ গ্রহণ না করায় তাহাদের মধ্যে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী চেতনা আসিতে পারে না, সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহারা বিপ্লবী আন্দোলন চালাইতে পারে না)। নেহাৎ গরীব যে কৃষক, যাহার জমিজমা নাই, যে একেবারে সর্ব্বহারা ক্ষেত-মজুরে পরিণত হইয়াছে, তাহাকেও যদি প্রশ্ন করা যায়, "তুমি কি পাইলে সুখী হও", তাহা হইলে সে যে উত্তর দিবে তাহা হইবে অনেকটা তালুকদার বা ধনী গৃহস্থ (যে অনেক ক্ষেত-মজুর খাটায়) হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ। এমন কি, ভিক্ষুক ভবঘুরেদের যদি এমন প্রশ্ন করা যায়, তাহা হইলে তাহারাও নিশ্চয়ই সমাজতন্ত্রের সমর্থনে কোনও জবাব দিবে না। আর মধ্যবিত্তদের মধ্যে যদি কাহাকেও এই প্রশ্ন করা হয় (সে অশিক্ষিতই হউক কি উচ্চশিক্ষিত বা গরীব নিম্নমধ্যবিত্তই হউক), তাহা হইলে উত্তরে কেহ কেহ হয়ত একজন টাটা, একজন বিড়লা বা স্যার আর, এন্, মুখার্জ্জি হইবার অভিলাষ বা কেহ কেহ হয়ত জজ-ব্যারিষ্টার হইবার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিবে। মোটকথা, শ্রমিক ভিন্ন অন্য সকলেই যে উত্তর দিবে, তাহা হইল ধনিক প্রথাকে, শোষণ প্রথাকে বাঁচাইয়া রাখিবার কথা। নিম্নমধ্যবিত্তদের মধ্যে অনেকেই ধনিকদের উপর খুব ক্ষেপা, কিন্তু তাহাদেরও অভিলাষ অন্য ধনিকদের লুপ্ত করিয়া নিজে ধনিক হওয়া, ধনিকদের ধ্বংস করিতে চাহিলেও ধনিক প্রথাকে ধ্বংস করিতে তাহারা শ্রেণী হিসাবে রাজী নয়। ইহার কারণ এই যে, যদিও মধ্যবিত্তগণ ধনিকদের দ্বারা শোষিত এবং তাহাদিগকে

অনেক সময় এমনকি শ্রমিকদের চাইতেও অভাবে দিন কাটাইতে হয়, তবু তাহাদের সামান্য যাহা আয় তাহাও আসে ধনিকপ্রথা বজায় থাকিবার ফলে। কোনও কারখানার একজন কেরাণী হয়ত বেতন পায় সাধারণ শ্রমিকদেরও আয়ের অর্দ্ধেক, খাটুনি খাটে হয়ত সাধারণ শ্রমিকদের চাইতেও বেশী ; সুতরাং সে যে মালিকদের দ্বারা খুবই শোষিত হয় সেই বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই ; কিন্তু যে সামান্য বেতন সে পায় সেটা মালিকদের লাভেরই একটা খুব ক্ষুদ্র অংশ অর্থাৎ শোষণেরই একটা অংশ , সে নিজে কোনও উৎপাদনই করে না। ইহারা একাধারে শোষিত ও শোষক, তাই ইহারা একবার আসে শোষিতদের দিকে আবার যায় শোষকদের দিকে। [খুব কম সংখ্যক কেরাণীর কাজই উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় ; ইহারা অধিকাংশই বণ্টনের হার কষে। সামান্য যে কয়-জন কেরাণীর কাজ উৎপাদনের পক্ষে সাহায্যকারী, অধিকাংশ কলকারখানাতে তাহারা প্রায়ই "মজুর-কেরাণী" (লেখার ক্লার্ক) নামে অভিহিত]। সুতরাং সম্পূর্ণ শ্রেণী হিসাবে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে যোগ দিবে এবং বিপ্লবে নেতৃত্বও নিবে শ্রমিকশ্রেণী। অন্যান্য শোষিত শ্রেণী হইতে যাহারা বিপ্লবে যোগ দিবে তাহারা থাকিবে দোদুল্যমান, দোটানায় ; তাই তাহারা বিপ্লবে নেতৃত্ব নিবার পক্ষে অনুপযুক্ত। ইহা অনেকের নিকটই হয়ত আশ্চর্য্য বোধ হইবে যে অশিক্ষিত, অবুঝ-শ্রমিকগণ কি করিয়া বিপ্লবে নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, অবুঝ শ্রমিকেরও সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান আছে, কিন্তু অন্যশ্রেণীর মধ্যে যাহারা বুদ্ধিমান, উচ্চ শিক্ষিত লোক, তাহাদেরও সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই (যদি না তাহারা শ্রমিক-শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থ মিলাইতে পারে)। আর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের অর্থ শ্রমিকদের মধ্যে যাহারা শ্রেণী-সচেতন, অগ্রগামী শ্রমিক, তাহাদের নেতৃত্ব—শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব। কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে অবশ্য স্বশ্রেণীত্যাগী সর্ব্বহারারাও আছে ; শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শ গ্রহণ করি-বার ফলে ইহাদিগকেও শ্রমিকশ্রেণীতেই ফেলা চলে, কেন না আদর্শ গ্রহণ করা এবং সেই আদর্শ অনুসারে কাজ করা অনুযায়ীই শ্রেণীবিচার করিতে হইবে ;

নতুবা যদি শুধু পেশা অনুসারে শ্রেণী বিচার করিতে হয় তাহা হইলে অনেক সচেতন শ্রমিককেই আর শ্রমিক বলা চলে না, কারণ খুব কম-সংখ্যক সচেতন শ্রমিকই ধনিকদের অধীনে বেশী দিন কাজ করিবার সুযোগ পায়। তবে, শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্য হইতে যাহারা সাম্যবাদী হয়, তাহাদের সঙ্গে স্বশ্রেণীত্যাগী সর্ব্বহারা-দের সাময়িকভাবে কিছুটা প্রভেদ থাকিয়া যায়। মানুষের মনকে পরিবর্ত্তন করা সহজসাধ্য নয়, পুরাতন শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রায়ই মনের কোণে উঁকি ঝুকি মারে, সেইজন্য স্বশ্রেণীত্যাগী সর্ব্বহারাদিগকে খুব সন্তর্পণে চলিতে হয়। শ্রমিকশ্রেণীর লোকের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক চিন্তা, তাহাদিগকে তাহা বিচার বিবেচনা করিয়া বুঝিতে হয় এবং সব সময়েই খেয়াল রাখিতে হয় যে তাহাদিগকে শ্রমিক-মন নিয়া, একজন সচেতন শ্রমিক হিসাবে সমস্ত প্রশ্ন বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

ধনিক বা মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক দুইরকম ভাব হইতে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে আসিতে পারে। সে হয়ত শ্রমিকদের দুঃখ কষ্ট, অভাব অভিযোগ দেখিয়া শোষক সমাজের উপর খুবই বিরক্ত হইয়া গেল এবং শোষিতদের মঙ্গল করিতে হইবে এইভাব নিয়া নিজের শ্রেণী ত্যাগ করিয়া ঘোষণা করিল—"আমি শ্রমিকদের পক্ষে"। ইহা হইল ভাবপ্রবণতার কথা। অথবা সে হয়ত সমাজের বৈজ্ঞানিক গতি বুঝিতে পারিয়া দেখিল যে সমাজকে (সুতরাং নিজেকেও) যদি নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে হয়, যদি নিজের ভবিষ্যৎ পুরুষদিগকে রক্ষা করিতে হয়, অর্থাৎ উপস্থিত ক্ষুদ্র স্বার্থ বাদ দিয়া যদি নিজের ভবিষ্যৎ বৃহৎ স্বার্থ রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে একমাত্র উপায় শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থ মিলাইয়া নিয়া সমাজতন্ত্রবাদ-সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করা। তাই সে ঘোষণা করিল—"আমি শ্রমিকদের একজন সাথী"। ইহা হইল বিচার বুদ্ধির কথা। "আমি শ্রমিকদের পক্ষে" এই জাতীয় ভাবপ্রবণতার কথায় বিপদ এই যে ইহাতে যেন লোকটির কোন স্বার্থ নাই, ইহা তাহার নিঃস্বার্থ ত্যাগের কথা। মানুষের মন সব সময় এক রকম নাও থাকিতে পারে, সে হয়ত কোনও কারণে শ্রমিকদের উপর বিরক্ত হইল বা নিজের ব্যক্তিগত কাজে ভয়ঙ্কর রকম জড়াইয়া পড়িল এবং তাই মনও

বিগড়াইয়া গেল। "আমি শ্রমিকদের একজন সাথী" এই মনোভাব যাহার, সে নিজের স্বার্থ বুঝিয়াই শ্রমিকদের সঙ্গে আসিয়াছে, কাজেই তাহার সরিয়া পড়িবার সম্ভাবনা কম। সরিয়া পড়িলে তাহার নিজের স্বার্থও নষ্ট হইবে, কাজেই তাহার ব্যবহার, কাজকর্ম্ম হইবে একজন সচেতন শ্রমিকের মত। শ্রমিক কৃষকদের হিতৈষী একজন হয়ত শ্রমিক কৃষকদের জন্য (সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য) অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া খাটিতেছে, এমতাবস্থায় কোনও আন্দোলনের সময় শ্রমিক বা কৃষকেরা তাহাকে শত্রু মনে করিয়া ভীষণ রকম জখম করিল—তখন কি আর অন্যের (বিশেষতঃ নিমকহারামদের) উপকার করিবার আগ্রহ থাকিবে? কিন্তু যে ব্যক্তি শ্রমিক চাষীদেরই একজন সচেতন সাথী, সে তাহার ভাইদের নিমকহারাম মনে করিবে না, সে বুঝিতে পারিবে যে তাহার শ্রেণীর লোকেরা একেবারেই অন্ধ, অচেতন, শত্রু মিত্র চিনিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তাহাদের নাই; এমতাবস্থায় সে তাহার খাটুনি বাড়াইয়া দিবে, কেননা আরও বেশী পরিশ্রম না করিলে ইহাদিগকে সচেতন করা চলিবে না এবং ইহারা সচেতন না হইলে বিপ্লব করিবে কে? আর, তাড়াতাড়ি বিপ্লবকে জয়যুক্ত করা সমস্ত শোষিতদের স্বার্থ। যেখানে সকলকে সচেতন করা তাহারও স্বার্থ সে অবস্থায় সে সকলকে ত্যাগ করিবে কি ভাবে? তাহাদের ব্যবহারে রাগ হইতে পারে, দুঃখ হইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইবার প্রশ্ন আসে না, তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া তাহাদিগকে সচেতন করিতেই হইবে, এইজন্য নিজের জীবন বিপন্ন করিতে হইলেও গত্যন্তর নাই। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে আজীবন লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত ও অনাহার-ক্লিষ্ট চাষীরা যখন রাজধানী প্যারী নগরীতে অত্যাচারী ধনী শোষকদের উপর পাল্টা অত্যাচার সুরু করিল এবং অসংস্কৃত ও অশিক্ষিত জনগণের অদম্য প্রতিহিংসার স্পৃহা হইতে যখন এই অত্যাচার জঘন্য বীভৎসতাতে যাইয়া দাঁড়াইল, সেই সময় নেতাদের অনেকেই বিগড়াইয়া গেলেন এবং ঘৃণায় নাক সিটকাইয়া চাষীদের ত্যাগ করিলেন। সেই সময়ে একজন নেতার কথা খুবই প্রণিধান-যোগ্য। কথাগুলি অনেকটা এইরূপ: "বন্ধুগণ!

এই সকল চাষীরা অসভ্য, অশিক্ষিত, ইহাদের ব্যবহার জঘন্য—তোমাদের এই সকল অভিযোগই সত্য। কিন্তু তোমাদিগকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। ইহারা যে অসভ্য, অশিক্ষিত, তাহার জন্য দায়ী কে? ইহাদের ভদ্রতা-জ্ঞান নাই, ইহারা যে কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-হীন, তাহার জন্য দায়ী কি ইহারা? প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা, এই ধনী সমাজই তজ্জন্য দায়ী। কাজেই, এতদিনকার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতেই হইবে। চাষীরা যে বীভৎস ব্যবহার করিতেছে তাহা নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু এইজন্য দায়ী ধনীগণ। মানুষকে তাহারা মানুষ হইবার সুযোগ দেয় নাই, একদিন যাহারা মানুষ ছিল তাহাদিগকে পর্য্যন্ত তাহারা অমানুষে পরিণত কারিয়াছে। সেই অমানুষদের যদি মানুষ করিতে চাও, যদি এই বীভৎসতা চিরদিনের জন্য দূর করিতে চাও, তাহা হইলে এতটুকু বীভৎসতা সহ্য করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে, নতুবা চিরদিনই তাহারা অমানুষ থাকিয়া যাইবে এবং যখনই অসহ্য অত্যাচারের প্রতিশোধ নিবার বিন্দুমাত্র সুযোগ ঘটিবে তখনই তাহারা জঘন্য হইয়া উঠিবে। যে এই বীভৎসতা চিরতরে বন্ধ করিতে চায়, যে সমাজের মঙ্গল চায়, যে সকলকে মানুষ করিতে চায়, সে কোনও অবস্থাতেই এই অসভ্য ও অশিক্ষিত চাষীদিগকে ত্যাগ করিতে পারে না।"

প্রথমোক্ত নেতারা চাষীদের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন ভাবপ্রবণতা হইতে, তাহাদের উপকার করিবার জন্য। তাই তাহারা বিপ্লবের ভীষণতা ও জঘন্যতা দেখিয়া পিছাইয়া পড়িলেন। আর শেষোক্ত নেতা চাষীদের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থ মিলাইয়া লইতে পারিয়াছিলেন বিচার-বুদ্ধি দ্বারা, তিনি ছিলেন চাষীদেরই একজন সাথী, তাহাদের সচেতন ভাই।

শ্রমিকশ্রেণীর প্রকৃত আপনার লোক যে, যে সচেতন শ্রমিক, সাম্যবাদী, সে কোনও অবস্থাতেই শোষিতদের ত্যাগ করিতে পারে না, কারণ তাহা হইলে বিপ্লবকে জয়যুক্ত করিয়া নিজের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভবপর নয়। সেইরূপ, তাহার পক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির, কমিউনিস্ট পার্টির বাহিরে থাকাও সম্ভবপর নয়, সে কোনও অবস্থাতেই পার্টিকে ত্যাগ করিতে পারে না; কেননা সমাজতন্ত্রবাদ-সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে

সর্ব্বপ্রথম পার্টির প্রয়োজন। এই অস্ত্রের সাহায্য ছাড়া শোষণযন্ত্র ধ্বংস হইবে না। শ্রমিক বা শ্রমিকশ্রেণীর আপনার লোক যে, সে স্পষ্টই বুঝিতে পারে যে শ্রমিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিতে, সাম্যবাদী পার্টিতে যোগদান করা তাহার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি এমনও হয় যে, কমিউনিস্ট পার্টি (বা পার্টির অধিকাংশ সভ্য) একটা ভুল পথে চলিতেছে বলিয়া কোন শ্রমিক-স্বার্থকামীর সন্দেহ হয়, তাহা হইলেও তাহাকে পার্টিতে যোগদান করিতে হইবে। শ্রমিকরা সব সময়েই ভুল করে, সেইজন্য সচেতন শ্রমিক কি তাহার ভাইদের ছাড়িতে পারে? বরং তাহার কর্ত্তব্য তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্টভাবে থাকিয়া তাড়াতাড়ি এই ভুল সংশোধন করিতে চেষ্টা করা। পার্টি কোন ভুল করিতেছে মনে হইলে প্রকৃত শ্রমিকবন্ধুর কাজ পার্টিতে যোগদান করিয়া সেই ভুল যাহাতে তাড়াতাড়ি সংশোধিত হয় তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা; পার্টি ভুল করিতে থাকিলে বিপ্লবই জয়যুক্ত হইবে না! তাই, পার্টি ভুল করিতেছে এই অজুহাতে পার্টির বাহিরে থাকাও চলে না বা তাহা ত্যাগ করাও চলে না। যদি কেহ এইরূপ করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সে শ্রমিকশ্রেণীর লোক নয়, সে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কোন দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত নয়।

কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যকে খুব দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন হইতে হইবে এবং নিজে দায়িত্ব নিয়া কাজ করিবার সাহস তাহার থাকা চাই। অন্যের আদেশ বা উপদেশের দিকে সব সময়ে চাহিয়া না থাকিয়া প্রয়োজন বোধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কাজ করিবার মত কর্ম্মপ্রবণতা পার্টি-সভ্যের আর একটি প্রয়োজনীয় গুণ। প্রত্যেক পার্টি-সভ্য হইল এক এক জন নেতা, কাজেই নেতার উপযুক্ত গুণ তাহাকে অর্জ্জন করিতে হইবে। দায়িত্ব নিবার সাহস (Responsibility) এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কাজ করিবার আগ্রহ (Initiative) এই দুইটি সাম্যবাদীর পক্ষে বিশেষ গুণ, এই দুইটি গুণ না থাকিলে প্রকৃত বিপ্লবী হওয়া চলে না। যে সচেতন শ্রমিক, সে কি অন্যের অপেক্ষায় চাহিয়া থাকিবে? তাহার কাজ অফুরন্ত। আর কেহই যদি কাজ না করে, সাহায্য না করে,

তাহা হইলে সচেতন শ্রমিককে একাই সব কিছু করিতে হইবে; সকলকে সচেতন করিয়া তুলিবার দায়িত্ব তাহার। বিশেষতঃ বিপ্লবের সময় নেতাকে অনেক সময়েই একা একা সাহস করিয়া এক একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে, তখন অন্যের অপেক্ষায় বসিয়া থাকা বা বিলম্ব করিবার অর্থ, বিপ্লবের বিরুদ্ধাচরণ করিবার সমতুল্য, কাজেই বিপ্লবী নেতাকে পূর্ব্ব হইতে উপযুক্ত গুণাবলী অর্জ্জন করিতে হইবে। এইজন্য পার্টির প্রত্যেকটি সভ্যকে সাম্যবাদের দার্শনিক ভিত্তি মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদ সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে, পার্টির কলাকৌশল সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন হইতে হইবে—নতুবা পদে পদেই ভুল হইবার সম্ভাবনা।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীভূততা (Democratic Centralism) এবং আত্ম-সমালোচনা (self-criticism) কমিউনিস্ট পার্টির দুইটি বিশেষ গুণ। কমিউনিস্ট পার্টির সমস্ত উর্দ্ধতন কমিটিগুলি সমুদয় সভ্যদের দ্বারা গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্ব্বাচিত হয়। পার্টির মধ্যে প্রত্যেক সভ্য তাহার স্বাধীন মতামত জ্ঞাপন করিতে পারে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পার্টি (অধিকাংশ সভ্য) কোন একটি বিষয়ে নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক সভ্য তাহার স্বাধীন মতামত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া পার্টির সমুদয় সভ্যদিগকে তাহার কথা বুঝাইতে পারিবে। কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে পার্টি কোনও ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে উক্ত সিদ্ধান্তই পার্টির সমুদয় সভ্যের মত বলিয়া গৃহীত হইবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পার্টির অধিকাংশ সভ্যের মতানুযায়ী ঐ সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন সভ্য উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চলিতে পারিবে না বা প্রচার করিতে পারিবে না। নতুবা যাহার যেমন খুশী চলিলে কোনও বিপ্লবী পার্টির কাজ চলিতে পারে না। এইরূপ উর্দ্ধতন কমিটি কোনও নির্দ্দেশ দিলে, পার্টির সমুদয় সভ্যকে প্রথমতঃ তাহা মানিতেই হইবে। কিন্তু অধিকাংশ সদস্য যদি এই নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে হন, তাহা হইলে এই নির্দ্দেশ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ইহারই নাম গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীভূততা—একদিকে সভ্যদের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার, আর একদিকে উর্দ্ধতন কমিটিগুলির হাতে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা।

পার্টির কোনও কমিটির বা কোনও সভ্যের কাজ যদি অন্যের পছন্দমত না হয় (অর্থাৎ অন্যেরা যদি উহা বিপ্লবের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া মনে করে), তাহা হইলে সেই সভ্য সেই সম্বন্ধে কমিটির ভিতরে সমালোচনা করিতে পারিবে। এইভাবে পরস্পরের ভুল-দোষগুলি দূর হয়—পার্টিকে ঠিকমত বিপ্লবের পথে চালাইবার ইহা প্রকৃষ্ট উপায়। এই আত্মসমালোচনার অর্থ, ব্যক্তিগত ঝগড়া নয়। ইহার অর্থ, পরস্পরকে সংশোধন করিতে সাহায্য করিয়া নিজদিগকে প্রকৃত বিপ্লবী হিসাবে গড়িয়া তোলা এবং এইভাবে বিপ্লবের জয় সুনিশ্চিত করিয়া তোলে।

পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; ইহাতে সমস্ত সচেতন শ্রমিক-গণ, সকল সাম্যবাদীগণ যোগদান করিবে। কিন্তু পার্টি ছাড়াও শোষিতদের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান দেখা যায়, যেমন ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি প্রভৃতি। জনগণের অর্থনৈতিক দাবীদাওয়াগুলি মিটানই এই সকল গণশ্রেণী-প্রতিষ্ঠান-গুলির উদ্দেশ্য, যদিও সাধারণ অর্থনৈতিক দাবীদাওয়াগুলিকে পূরণ করিতে যাইয়া এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে কিছুটা রাজনীতিক-ক্ষেত্রে গিয়া পড়িতে হয়। সমস্ত জনগণই এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলির সভ্য হইতে পারে এবং হয়ও তাহাই। ছোটখাট অর্থনৈতিক দাবীদাওয়াগুলি পূরণ করিবার জন্য শ্রমিকরা তাহাদের গণশ্রেণী-প্রতিষ্ঠান ট্রেড ইউনিয়নের সভ্য হয় এবং কৃষকরা তাহাদের গণশ্রেণী-প্রতিষ্ঠান কৃষক সমিতির সভ্য হয়। এইগুলির সভ্য হইবার জন্য কোনও রাজনৈতিক চেতনার প্রয়োজন হয় না; সাধারণ ক্ষুদ্র স্বার্থবোধই এই জন্য যথেষ্ট। মালিকদের নিকট হইতে দৈনন্দিন অর্থনৈতিক সুখসুবিধা আদায় করিবার জন্য এবং তাহাদের জোর জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে একত্রে দাঁড়াইবার জন্য গঠিত এই সকল গণশ্রেণী-প্রতিষ্ঠানগুলি জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষাক্ষেত্র। মালিকদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অনুসারে গঠিত ট্রেড ইউনিয়ন-গুলির আন্দোলনের ভিতর দিয়া এই সচেতনতা আসে যে, শুধু মাত্র অর্থ-নৈতিক আন্দোলনই যথেষ্ট নয়, অবস্থা ফিরাইতে হইলে রাজনৈতিক আন্দোলন করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং অধিকতর সচেতন যাহারা তাহারা বুঝিতে

পারে যে, ধনিকব্যবস্থা ধ্বংস না করিলে তাহাদের অবস্থার স্থায়ী উন্নতি হইতে পারে না। এবং ধনিকব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আনিবার জন্য সমস্ত বৃত্তিতে যে সকল সচেতন শ্রমিক আছে, তাহাদিগকে লইয়া রাজনৈতিক পার্টি গড়িবার প্রয়োজনীয়তাও ক্রমে বুঝিতে পারে। ঠিক এইরূপে, কৃষক সমিতির আন্দোলনের ভিতর দিয়া সাধারণ কৃষকদের যে অভিজ্ঞতা হয়, তাহাতে তাহারা রাজনৈতিক আন্দোলন করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং অধিকতর সচেতন যাহারা তাহারা শোষণ-ব্যবস্থা ধ্বংস করিবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারে। শুধু বই পড়িয়া বা বক্তৃতা শুনিয়া জনগণের বিপ্লবী চেতনা আসে না, বিশেষতঃ শ্রমিক-কৃষকেরা ত প্রায় সকলেই অশিক্ষিত, অজ্ঞ। লেনিন বলিয়াছেন, "জনগণ নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বিপ্লবী শিক্ষা লাভ করে এবং গণশ্রেণী-প্রতিষ্ঠানগুলি হইল অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া বিপ্লবী শিক্ষা গ্রহণ করিবার স্কুল।" কমিউনিস্ট পার্টি যে সমস্যার সমাধান করিতে চায় তাহা শ্রমিক কৃষকের জীবনের সমস্যা; অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া নিজেদের ব্যবহারিক সমস্যাগুলি বুঝিয়া তাহার সমাধানের পথ বাহির করা শ্রমিক কৃষকের পক্ষে খুব কঠিন নয়। অন্যান্য শ্রেণীর লোকদিগকে যাহা বহুদিনব্যাপী বিপ্লবী শিক্ষার মধ্য দিয়া বুঝিতে হয়, (পুস্তকাদি পাঠ ও জনগণের সঙ্ঘের মধ্যে থাকিয়া কাজকর্ম্ম করিবার ভিতর দিয়া যাহা অর্জ্জিত হয়) নিপীড়িত জনগণ তাহা নিজেদের সমস্যা দিয়াই বুঝিতে পারে। শ্রমিক বা কৃষকদিগকে যদি প্রথমেই বলা হয়, "ধনিক গভর্ণমেণ্ট তোমাদের শত্রু; এই গভর্ণমেণ্ট ধ্বংস না করিলে তোমাদের অবস্থা ফিরিবে না; তোমাদের মালিকদের সঙ্গে সরকারের যোগাযোগ আছে, প্রভৃতি" তাহা হইলে তাহারা বিশ্বাস করিবে না এবং ধনিক-ব্যবস্থা ধ্বংস করিবার জন্য অগ্রসরও হইবে না; কিন্তু সামান্য কিছু অর্থ-নৈতিক দাবীদাওয়া পূরণ করিবার জন্য যখন ইহারা ট্রেড-ইউনিয়ান বা কৃষক সমিতির মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া মালিকদের বিরুদ্ধে কোনও রকম আন্দোলন সুরু করিবে, তখন অতি শীঘ্রই তাহাদের উপরোক্তরূপ বিপ্লবী অভিজ্ঞতা হইবে, কেন না কয়েক দিনের মধ্যেই

তাহারা দেখিবে যে দারোগা পুলিশ সব আসিয়া হাজির এবং তাহারা সকলে মালিকদের পক্ষে; সরকারের বিধান অনুযায়ী হয়ত আন্দোলনকারীদের পক্ষে সভাসমিতি করা, পিকেটিং করা প্রভৃতি বে-আইনী হইল অথচ ইহা সকলেই জানে যে, এইগুলির সাহায্য ছাড়া আন্দোলনকে জয়যুক্ত করা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং এই বিপ্লবী অভিজ্ঞতার ফলে তাহারা ক্রমে রাষ্ট্র দখল করিবার জন্য রাজনীতিক আন্দোলনে আসিয়া পড়িবে।

এই জন্যই সাম্যবাদীগণ আপ্রাণ চেষ্টা করে জনগণের গণশ্রেণী-প্রতিষ্ঠান-গুলিকে ব্যাপক ও শক্তিশালী করিবার জন্য। এইগুলি জনগণের বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান, এইগুলির ভিতর দিয়া যে বিপ্লবী অভিজ্ঞতা হয়, তাহার ফলেই জনগণ বিপ্লবী আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। যাহাতে জনগণ তাড়াতাড়ি বিপ্লবী অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারে সেইজন্য সাম্যবাদীগণ সমস্ত গণ-আন্দোলনের সম্মুখে যাইয়া পড়ে এবং আন্দোলনকে ব্যাপকতর করিতে চেষ্টা করে। যত বেশী-সংখ্যক লোককে বিপ্লবী গণশ্রেণী-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আনিতে পারা যায়, বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষে ততই ভাল। এই জন্যই সাম্যবাদীগণ সমস্ত শ্রমিক কৃষক প্রভৃতিকে তাহাদের শ্রেণী-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আনিতে চেষ্টা করে। জনগণ তাহাদের গণ-প্রতিষ্ঠানের মারফত দৈনন্দিন সংগ্রামের ভিতর দিয়া যে সকল অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়, সেইগুলি স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেওয়া সাম্যবাদী-দের কাজ—এবং যাহাতে জনগণ অল্প সময়ের মধ্যে এই রকমের বিপ্লবী অভিজ্ঞতা বেশী অর্জ্জন করিতে পারে সেইজন্য সাম্যবাদীগণ সর্ব্বদাই গণ-আন্দোলনের পক্ষপাতী। যেখানেই জনগণ আছে সেখানেই সাম্যবাদীদের কাজ; নিপীড়িত জনগণ যাহাতে নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সেইজন্য তাহারা চেষ্টা করে এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণের যে কোনও আন্দোলনে তাহারা সাহায্য করে।

প্রশ্নমালা

১। শ্রমিকশ্রেণী সকলের চাইতে বেশী বিপ্লবী কেন? ভিক্ষুকেরা কি বিপ্লবী?

২। শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবে নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে কেন? উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী কি নেতৃত্বের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত নয়? বিশদ আলোচনা কর।

৩। "আমি শ্রমিকদের পক্ষে" এবং "আমি শ্রমিকদের একজন"—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি সাম্যবাদীদের কথা? কেন? উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

৪। প্রকৃত সাম্যবাদী কি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির বাহিরে থাকিতে পারে? কারণ দেখাইয়া উত্তর দেও।

৫। কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যের কি কি গুণ থাকা দরকার?

৬। বিপ্লবের পক্ষে জনগণের অর্থ-নৈতিক শ্রেণী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয়তা কি? ইহাদের সঙ্গে সাম্যবাদের কি সম্পর্ক?



এগার

আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি যে আদিম সাম্যবাদী যুগের কথা ছাড়িয়া দিলে এই পর্য্যন্ত দুনিয়াতে যত রকম সমাজ-ব্যবস্থা গিয়াছে, সেইগুলি সকলই জনসাধারণের শোষণের উপর ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং বর্ত্তমানে একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়ান ভিন্ন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই শোষণ চলিতেছে। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, উৎপাদন-শক্তিগুলির ক্রমবিবর্ত্তন ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শোষণের রূপ এবং প্রকৃতিও বদলাইয়া যায়। দাস প্রথার যুগে শোষণ ছিল একরকম—ক্রীতদাসরা পরিশ্রম করিয়া ধন সম্পত্তি উৎপাদন করিত এবং প্রভুরা (দাস-মালিক) সেই সম্পত্তি ভোগ করিত ; সামন্ত-তান্ত্রিক যুগে ভূমি-দাসরা ছিল সমাজের উৎপাদক শ্রেণী, কিন্তু সম্ভোগ করিত সামন্তগণ। বর্ত্তমানে, ধনিক সমাজে যে শোষণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত আছে, তাহাকে বলা হয় ধনতান্ত্রিক বা ধনিক (শোষণ) ব্যবস্থা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমাজে যে শোষণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহার সঙ্গে বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার প্রভেদ এই যে এই ব্যবস্থা অধিকতর নিপুণ, সহজে ধরা যায় না, আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় যেন এই ব্যবস্থা ন্যায়ের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এখন প্রশ্ন, ধনতান্ত্রিক শোষণটা কি এবং কি ভাবেই বা ইহা চলে।

ধনিক সমাজে "লাভ" বা "মুনাফা" কথাটা খুবই চল্‌তি কথা, আমরা সদা সর্ব্বদা ইহা ব্যবহার করি। প্রকৃত পক্ষে এই মুনাফা জিনিষটাই হইল ধনতান্ত্রিক সমাজের শোষণ। পুঁজিপতি (মূলধনের মালিক) কোনও ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে যতটা মূলধন খাটায় তাহার চাইতে বেশী আদায় করে। পুঁজিপতি

নিজে কোনও পরিশ্রম করে না। সে জায়গা জমি, কলকব্জা, কাঁচামাল প্রভৃতি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উৎপাদন-শক্তিগুলি যোগায় এবং কিছু মজুর নিয়োগ করে, এই উৎপাদন-শক্তিগুলি কাজে লাগাইবার জন্য, এইগুলি নিয়া খাটুনি খাটিয়া মূল্য সৃষ্টি করিবার জন্য।

অর্থনীতিশাস্ত্রের ভাষায় মূল্য দুই প্রকার—ব্যবহারিক ও বিনিময়গত শুধু মূল্য বলিতে আমরা বিনিময় মূল্যকেই বুঝি। মানুষের পরিশ্রমদ্বারা এই বিনিময় মূল্য সৃষ্টি হয় অর্থাৎ যেহেতু কোনও একটা জিনিষ তৈয়ার করিতে বা সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করিবার জন্য লোকে পরিশ্রম করিয়াছে, শুধু সেইজন্যই জিনিষটা বাজারে অন্য জিনিষের সঙ্গে বিনিময় হয়। অবশ্য, যে সকল জিনিষের বিনিময় মূল্য আছে, তাহাদের নিশ্চয়ই ব্যবহারিক মূল্যও আছে অর্থাৎ সেই জিনিষটা নিশ্চয়ই লোকের প্রয়োজনে লাগে, নতুবা সেই জিনিষ লোক নিবে কেন? কিন্তু যে সকল জিনিষের ব্যবহারিক মূল্য আছে তাহাদের সকলেরই বিনিময় মূল্য নাই, যদি না সেই ব্যবহারিক মূল্য সৃষ্টি করবার জন্য লোকের পরিশ্রম হইয়া থাকে। অবস্থা ভেদে একই জিনিষের সময়ে বিনিময় মূল্য থাকিত পারে, সময়ে নাও থাকিতে পারে। জল ও বাতাসের ব্যবহারিক মূল্য নিশ্চয়ই দুনিয়ার অন্য সকল জিনিষ হইতে বেশী, কিন্তু এইগুলির কোনও বিনিময় মূল্য নাই, এইগুলি বাজারে বিক্রয় হয় না। কিন্তু যে অঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যায় না, সেই অঞ্চলে যদি কেহ বিশুদ্ধ পানীয় জল দূর হইতে নিয়া আসে, তাহা হইলে সেই পানীয় জলের বিনিময় মূল্য সৃষ্টি হয়। তাহা পণ্য হিসাবে বাজারে বিক্রয় হয় কেন না লোকের পরিশ্রমের ফলে উহা সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী হইয়াছে। বন অঞ্চলে যেখানে কাঠ আপনা আপনি জন্মে, সেখানে কাঠের কোনও বিনিময় মূল্য নাই; কিন্তু এই কাঠই যখন কেহ পরিশ্রম করিয়া লোকালয়ে নিয়া আসে তখন ইহার বিনিময় মূল্য সৃষ্টি হয়। আলো বাতাস প্রভৃতি ত অফুরন্ত, কিন্তু অতিপ্রয়োজনীয় প্রকৃতির দানকে কেহ যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করিতে পারে তাহা হইলে এইগুলি হইতেও সে ব্যক্তিগত অধিকারের বলে বিনিময় মূল্য আদায়

করিতে পারে। এই জন্যেই শহরে আলো বাতাসপূর্ণ বাড়ী ঘরের ভাড়া অপেক্ষাকৃত বেশী।

কেহ কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবে যে, যদি পরিশ্রমের ফলেই বিনিময় মূল্য সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে একই জিনিষের দাম এক সময়ে বেশী অন্য সময়ে কম হইবে কেন? ইহার দুইটি কারণ হইতে পারে। প্রথমতঃ একই জিনিষ তৈয়ার করিতে সমাজে সব সময় একই মাত্রায় পরিশ্রম প্রয়োজন হয় না। যন্ত্রশিল্প আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে মানুষকে কোনও জিনিষ উৎপাদন করিবার জন্য যে পরিমাণ পরিশ্রম করিতে হইত, যন্ত্রশিল্প আবিষ্কৃত হইবার ফলে সেই এক পরিশ্রমে অনেক বেশী জিনিষ উৎপাদন হইতে পারে; এবং যন্ত্রশিল্পের যতই উন্নতি হইতেছে, কোনও জিনিষ উৎপাদন করিতে পরিশ্রমের মাত্রা ততই কমিয়া যাইতেছে। এইজন্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শিল্প দ্রব্যের দাম যতটা ছিল, এখন সাধারণতঃ তাহার চাইতে সস্তা। যন্ত্রশিল্পের ক্রমোন্নতির ফলে পণ্যের মূল্যের যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা দুই চারি দিনে হয় না।

বাজারে দৈনন্দিন দামের মধ্যে যে উঠা নামা হয় তাহার কারণ অন্যরূপ। কোনও জিনিষের চাহিদা যদি হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায় এবং সেই জিনিষ বাজারে যদি অপেক্ষাকৃত কম থাকে, তাহা হইলে ব্যবসায়ী জিনিষের দর চড়াইয়া দেয় এবং ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগীতার ফলে জিনিষটা কিছু বেশী দামে বিক্রীত হয়। পক্ষান্তরে কোনও জিনিষের চাহিদা যদি হঠাৎ কমিয়া যায় অথচ সেই জিনিষ চাহিদা অনুপাতে যদি বেশী মজুত থাকে, তাহা হইলে বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতি-যোগীতার অভাবে জিনিষের দাম কিছু কমিয়া যায়। [বর্ত্তমানে যুদ্ধের ফলে জিনিষ খুব দুষ্প্রাপ্য হওয়ায়, জিনিষ আদান প্রদান খুব ব্যয়-সাধ্য হওয়ায় অনেক জিনিষের দাম অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে। সাধারণ প্রয়োজনীয় অনেক জিনিষই যুদ্ধের জন্য খুব দরকার হওয়ায় সেইগুলি এখন সাধারণ ব্যবহারের জন্য বড় পাওয়া যায় না, তাই দাম খুব চড়া।]

সাধারণতঃ বাজার দরের যে তারতম্য তাহা খুব বেশী উঠে না, বা খুব বেশী কমেও না, আর এই তারতম্য খুব দীর্ঘস্থায়ীও হয় না। কোনও জিনিষের

চাহিদা বাড়িয়া গেলে ক্রমে উৎপাদনও বাড়িয়া যায়, আবার চাহিদা না বাড়িতে থাকিলে উৎপাদনও ক্রমে কমিতে থাকে। কিন্তু দামের যতই উঠা নামা হউক না কেন সকল জিনিষের দামেরই এমন একটা মাত্রা আছে যাহার নীচে ইহা যাইতে পারে না, যাহার নীচে গেলে ব্যবসায়ী লোকসান মনে করে এবং মালিক সেই জিনিষ উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেয়। কাজেই চাহিদার তারতম্যের জন্য সাময়িকভাবে বাজার দরের তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিনিময় মূল্য নির্দ্ধারিত হয় কোনও জিনিষের মধ্যে যতটুকু পরিশ্রম আছে তাহা দ্বারা। বাজার দর যদি কখনও এই মূল্যের নীচে পড়িবার সম্ভাবনা ঘটে, মালিক তখন উৎপাদন কমাইয়া দেয় বা বন্ধ করিয়া দেয়। আমরা বলিয়াছি কোনও জিনিষের মূল্য নির্দ্ধারিত হয় সেই জিনিষের মধ্যে যতটুকু পরিশ্রম আছে তাহা দ্বারা। কিন্তু একই জিনিষ তৈয়ার করিতে সকল লোকের একই রকম পরিশ্রম লাগে না। এই অবস্থায় কোন জিনিষের মূল্য কি হইবে তাহা ঠিক হয় কি ভাবে এবং ভিন্ন ভিন্ন লোক দ্বারা তৈয়ারী একই জিনিষের মূল্য ভিন্ন ভিন্ন রকম হয় না কেন? কোন জিনিষের মধ্যে কতখানি পরিশ্রম আছে তাহা ব্যক্তি বিশেষের পরিশ্রম দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় না। তাহা নির্দ্ধারিত হয় সমাজে যত রকম উপায়ে ঐ জিনিষটি উৎপাদন হয় তাহার গড়পরতা হিসাব করিয়া। একটা জিনিষ তৈয়ার করিতে সেই সমাজে গড়ে যে পরিশ্রম লাগে তাহাকেই ধরা হয় প্রয়োজনীয় পরিশ্রম বলিয়া।

উৎপাদন-শক্তিগুলিকে কাজে লাগাইবার জন্য শ্রমিক যে পরিশ্রম করে তাহার পুরা দাম সে পায় না, সে যে মজুরী পায় তাহা সে যতটা মূল্য সৃষ্টি করে তাহার চাইতে অনেক কম। বাকীটা যায় পুঁজিপতির মুনাফা হিসাবে। এই মুনাফা জিনিষটা যে মজুরের শ্রমলব্ধ মূল্যেরই একটা অংশ-বিশেষ তাহা আমরা দুই একটা উদাহরণ হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিব। ধরা যাক, কোন একজন কাঠমিস্ত্রী আট আনা দামে কিছু কাঠ কিনিল এবং নিজের ঘরে নিজের যন্ত্রপাতির সাহায্যে দুইদিন (দৈনিক আট ঘণ্টা) পরিশ্রম করিয়া একটি চেয়ার তৈয়ার করিল। এই চেয়ার বাজারে পাঁচ টাকায় বিক্রয় হইল। চেয়ার

বাবদ খরচ পড়িয়াছে—কাঠ আট আনার, ঘরভাড়া ধরা যাক দুই দিনে চারি আনা, রং বার্নিশ, যন্ত্রপাতি খরচ প্রভৃতি বাবদ আরও বার আনা—মোট খরচ দেড় টাকা। কিন্তু চেয়ারটা পাঁচ টাকায় বিক্রয় হওয়াতে স্বাধীন কাঠ-মিস্ত্রীর দুই দিনে আয় হইল সাড়ে তিন টাকা (চেয়ারের দাঁম পাঁচ টাকা হইতে খরচ বাবদ দেড় টাকা বাদ দিয়া)। এই সাড়ে তিন টাকা হইল মিস্ত্রীর দুই দিনের খাটুনি বা পরিশ্রমের মূল্য। সে কাঠ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি লইয়া দুই দিন পরিশ্রম করিবার ফলেই চেয়ার তৈয়ার হইয়াছে এবং নূতন সাড়ে তিন টাকা মূল্য সৃষ্টি হইয়াছে (কাঠের দাম, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সকল জিনিষ বাবদ যে খরচ গিয়াছে তাহা বাদ দিয়া দেখা গেল সাড়ে তিন টাকা নূতন মূল্য সৃষ্টি হইয়াছে)। কিন্তু একজন আসবাব পত্রের কারখানার মালিক না হইয়া যদি সেখানে মজুর হিসাবে কাজ করে সে মজুরী পায় দৈনিক (আট ঘণ্টা কাজ করিয়া) এক টাকা। সে দুই দিন কাজ করিয়া আট আনার কাঠ হইতে একটি চেয়ার তৈয়ার করিল এবং এই চেয়ারখানাও বাজারে পাঁচ টাকায় বিক্রয় হইল। এই ক্ষেত্রেও দুই দিনের ঘর ভাড়া পড়িয়াছে চারি আনা এবং যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য খরচ বাবদ গিয়াছে আরও অতিরিক্ত বার আনা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কাঠের দাম, ঘরভাড়া, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বাবদ মোট দেড় টাকা বাদ দিয়া বাকী সাড়ে তিন টাকা মজুর কাঠমিস্ত্রী পাইবে না। মজুর কাঠমিস্ত্রীকে দেওয়া হইবে দুই দিনের মজুরী বাবদ দুই টাকা। তাহার পরিশ্রমের বাকী মূল্যটা (অর্থাৎ নূতন সৃষ্টি মূল্য সাড়ে তিন টাকা হইতে দুই টাকা বাদ দিলে অবশিষ্ট যে দেড় টাকা থাকে তাহা) আসবাব পত্রের কারখানার মালিক মুনাফা বাবদ লইবে। এইভাবে মজুর কাঠমিস্ত্রীর পরিশ্রমের ফলে উৎপন্ন মূল্যের একটা বড় অংশ মালিক ভোগ করিবে উৎপাদনের উপায়গুলির উপর (কারখানা, যন্ত্রপাতি, কাঠ প্রভৃতির উপর) তাহার মালিকানা স্বত্বের জোরে। আর একটি উদাহরণ ধরা যাক্। একটি কাপড়ের মিলে বৎসরে তুলা আসিল মোট পঞ্চাশ হাজার টাকার, রং মাড় প্রভৃতি বাবদ খরচ পড়িল পাঁচ হাজার টাকা, যন্ত্রপাতির বাৎসরিক ক্ষয় বাবদ

খরচ পড়িল পাঁচ হাজার টাকা, কয়লার খরচ পাঁচ হাজার টাকা, জায়গা, কারখানা ঘর ও খাজনা বাবদ পড়িল পাঁচ হাজার টাকা এবং অন্যান্য নানারকম বাজে খরচ বাবদ গেল অতিরিক্ত পাঁচ হাজার টাকা। এইভাবে মোট পঁচাত্তর হাজার টাকা খরচ করিয়া যে কাপড় প্রভৃতি উৎপন্ন হইল তাহা বাজারে বিক্রয় হইল দেড় লক্ষ টাকায়। কারখানার শ্রমিকদের মজুরী ও কর্ম্মচারীদের বেতন বাবদ মালিকের ব্যয় হইল পঁচিশ হাজার টাকা। তুলা, কয়লা, কারখানা প্রভৃতি উৎপাদন-শক্তিগুলি বাবদ পঁচাত্তর হাজার ও শ্রমিকদের মজুরী বাবদ পঁচিশ হাজার, মোট এক লক্ষ টাকা খরচ করিয়া মালিক বা মালিকগণ বাকী পঞ্চাশ হাজার টাকা (কাপড়ের দাম দেড় লক্ষ টাকা হইতে মোট ব্যয় বাবদ এক লক্ষ টাকা বাদ দিয়া) নিজেদের মধ্যে কমিশন, ডিভিডেণ্ড প্রভৃতি বাবদ ভাগ করিয়া লইল। তুলা, কয়লা, কারখানা প্রভৃতি সব কিছুর খরচ ঠিক ঠিক মত চুকাইয়া এই পঞ্চাশ হাজার টাকা মালিকের মুনাফা আসিল কোথা হইতে? পূর্ব্বে যে কাঠমিস্ত্রীর কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে মালিকদের এই লাভ শ্রমিকদের পরিশ্রম-সৃষ্ট মূল্যের একটা অংশ, শ্রমিককে বঞ্চিত করিয়া মালিক ইহা ভোগ করে। যেহেতু উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক সে, সেইজন্য শ্রমিক বাধ্য হইয়া মালিকদের এই অন্যায় জুলুম সহ্য করিতেছে। নিজে পরিশ্রম না করিয়া লোকে যে টাকা আয় করে তাহা সমস্তই এইভাবে অন্যকে শোষণ করিবার ফলে আসে। লাভ বা মুনাফা নামক যে জিনিষটা প্রথম দৃষ্টিতে মালিকের ন্যায্য পাওনা বলিয়া মনে হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে আসে শ্রমিককে শোষণের ফলে, ইহা শ্রমিকের পরিশ্রমে উৎপাদিত নূতন মূল্যের একটি অংশ।

কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে শ্রমিক পরিশ্রম করিয়া যে মূল্য সৃষ্টি করে, তাহার সম্পূর্ণটাই সে মজুরী বাবদ পায়, মালিক যে মুনাফা নেয় তাহা মাল বিক্রয় করিবার সময় বাজারে সৃষ্ট হয়, কৌশলে ক্রেতাদের নিকট হইতে ইহা আদায় করা হয়। সহজ কথায়—ক্রেতাদিগকে ঠকাইয়া পণ্যের প্রকৃত মূল্যের চাইতে বেশী মূল্য নেওয়া হয়। এই যুক্তি স্বীকার করিবার অর্থ দাঁড়ায় এই যে,

সমস্ত ক্রেতারাই প্রতারিত হইতেছে এবং সমস্ত বিক্রেতারাই জুয়াচুরি করিতেছে, পণ্যের প্রকৃত মূল্যের চাইতে অধিকতর মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতেছে। কিন্তু ইহা কখনই সম্ভবপর নয়। প্রত্যেক লোকই যেমন ক্রেতা সে তেমন বিক্রেতাও বটে, প্রত্যেকেই এক পণ্য বিক্রয় করিয়া আর এক পণ্য ক্রয় করে। কাজেই যদি ক্রেতা হিসাবেই সকলে ঠকে এবং বিক্রেতা হিসাবে সকলেই ঠকায়, তাহা হইলে প্রত্যেক লোক একবার ঠকিতেছে আর একবার ঠকাইতেছে এবং এই ভাবে তাহার সম্পত্তি সব সময়েই সমান থাকিয়া যাইবে, ইহা বৃদ্ধি পাইবে না। ব্যক্তি বিশেষের বেলায় কদাচিৎ যদি ইহার ব্যতিক্রম ঘটেও (অর্থাৎ যদি একজন যাহা ক্রয় করে তাহার চাইতে বেশী বিক্রয় করে, বা যাহা বিক্রয় করে তাহার চাইতে বেশী ক্রয় করে), কিন্তু সমস্ত ব্যক্তির সমষ্টি জাতি হিসাবে ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না, মোট জাতীয় সম্পদ সব সময়েই এক থাকিয়া যাইবে, ইহা এক হাত হইতে অন্য হাতে বদলী হইতে পারে মাত্র। যদি সমাজে নূতন মূল্যই সৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে জাতীয় সম্পদের মূল্যও বাড়িতে পারে না, অথচ আমরা দেখি উন্নতিশীল জাতি সমূহের জাতীয় সম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় সমাজে নূতন মূল্য সৃষ্টি হইতেছে এবং আমরা দেখিয়াছি এই মূল্য সৃষ্টি করিতেছে শ্রমিকশ্রেণী, তাহার পরিশ্রমদ্বারা।

মালিক (ধনিক) শ্রেণীর কি মুনাফা ভোগ করিবার কোনও অধিকারই নাই? ধনিকদের মধ্যে দুই চারিজন দেখা যায় যাহারা অশেষ চেষ্টা করিয়া যে ধনসম্পত্তি জমা করিয়াছে তাহাই পুঁজি হিসাবে খাটাইয়া ক্রমে ধনী মালিক হইয়াছে, আবার ধনিক-সমাজে এমন লোকও বহু আছে যাহারা বহু কষ্টে অর্থোপার্জ্জন করিতেছে এবং সেই কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের সামান্য কিছু হয়ত কোনও ব্যবসায়ে খাটাইয়া অতি অল্পই লাভ করিতেছে। বহু কষ্ট করিয়া উপার্জ্জন করিবার ফলে যে ব্যক্তি কতকগুলি উৎপাদন-শক্তিকে নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদ করিবার প্রশ্ন উঠিলে অনেকেই আঁৎকাইয়া উঠিবেন। অথচ উৎপাদন-শক্তি-

গুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা-সত্ব লোপ করিয়া তাহাকে সমাজ-সম্পত্তিতে পরিণত করিতে না পারিলে শোষণ বন্ধ হইবে না, জনগণের দুঃখ দৈন্যের শেষ হইবে না। আর, প্রকৃতপক্ষে মালিকদের কষ্টোপার্জ্জিত ধন সম্পত্তির উপর ভিত্তি করিয়া ধনিক ব্যবস্থা ও সমাজ গড়িয়া উঠে নাই। অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, জুলুমবাজী এবং জনগণকে তাহাদের সম্পত্তি হইতে জোর করিয়া উচ্ছেদ সাধনের ভিতর দিয়াই ধনিক-প্রথার সূচনা বলা চলে। জোর জুলুম করিয়া ভারতবর্ষ ও অন্যান্য জায়গা হইতে ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া এবং দেশের জনসাধারণকে (চাষী প্রভৃতি) জোর করিয়া সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিয়া ইংলণ্ডের ধনিকরা তাহাদের সমাজের পত্তন করে। যে সকল ধনরত্ন তাহারা লুণ্ঠন করিয়া নিল, তাহাই হইল তাহাদের গোড়ার পুঁজি এবং জনসাধারণকে জমিজমা হইতে উচ্ছেদ করিবার ফলে পাইল তাহারা সর্ব্বহারা শ্রমিক। ইহারা মালিকদের যে কোন সর্ত্তে তাহাদের কলকারখানায় কাজ করিতে বাধ্য, সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ হইবার ফলে তাহাদের আর অন্য ভাবে জীবন যাপন করিবার উপায় নাই! সম্পত্তি হইতে উৎখাত হইয়া স্বাধীন জনগণ, যাহারা স্ব স্ব ব্যবসা দ্বারা স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিত, তাহারা কুলী মজুরে পরিণত হইল। ধনিক প্রথা ক্রমে ইংলণ্ড হইতে অন্যান্য জায়গায় ছড়াইয়া পড়ে এবং সকল দেশেই ধনিক প্রথার সূচনাতে এইরকম জোর জুলুম, সাধারণকে সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ প্রভৃতি দেখা যায়। আজ, ধনিক প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে সাধারণ গরীব লোকও হয়ত সময়ে দুই দশ টাকা খাটাইয়া থাকে, কিন্তু যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে সে এই সুযোগ পাইতেছে তাহার গোড়াতেই গলদ, তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে অন্যায় জোর জুলুমের উপর ভিত্তি করিয়া এবং ধনিক দেশগুলির জনসাধারণের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা স্পষ্টই বলা চলে যে, নেহাৎ জোর জুলুমের উপরই এই সমাজ দাঁড়াইয়া আছে, নতুবা নিপীড়িত জনগণ এক মুহূর্ত্তের জন্যও এই সমাজ বরদাস্ত করিত না।

মালিকদের লাভ করিবার কোনও অধিকার আছে কিনা এই সম্বন্ধে আর একটা উদাহরণ লইয়া আলোচনা করিব। বিহার অঞ্চলে জমিদারদের বাড়ীতে

এখনও নাকি এমন চাকর দেখা যায় যাহার পিতা, পিতামহ, এমন কি হয়ত প্রপিতামহ উক্ত জমিদারের নিকট হইতে এই চুক্তিতে কিছু টাকা (সামান্য দুই-এক টাকা মাত্র) ধার করিয়াছিল যে যতদিন সে এই টাকা পরিশোধ করিতে না পারিবে ততদিন জমিদার বাড়ীতে কাজ করিবে। কিন্তু এই পর্য্যন্ত আর সেই দেনা পরিশোধ হইয়া উঠে নাই। সারাদিন জমিদার বাড়ী বেগার খাটিয়া ধার শোধ করিবার মত অর্থ সে উপার্জ্জন করিবে কি ভাবে? তাই বংশ পরম্পরায় জমিদারের চাকর রহিয়া গিয়াছে। এই ধারও কখন পরিশোধ করা হইয়া উঠে না আর এই দাসগিরিও ঘুচে না। যদি কখনও কোন চাকর কোনও ক্রমে টাকা পরিশোধ করিবার জন্য জমিদারের নিকট টাকা দেয়, তখন জমিদার তাহাকে চুরি করিবার অপরাধে পুলিশে দেয়। প্রকৃত পক্ষে চুরি না করিলে সে টাকা পাইবেই বা কোথায়? এমন ঘটনা আমাদের নিকট বিস্ময়কর মনে হয়; কিন্তু ধনিক সমাজে শ্রমিকদের অবস্থা ঠিক এমনই নয় কি? কোনও একজন বা কয়েকজন পুঁজিপতি হয়ত কয়েক লক্ষ টাকা পুঁজি লইয়া এক কারবার সুরু করিল, কলকারখানা প্রভৃতি বসাইয়া শ্রমিক নিয়োগ করিল। প্রতি বৎসরই এই কারখানায় লাভ হইতেছে এবং এইভাবে লাভের পরিমাণ মূল পুঁজিকে বহুগুণে ছাড়াইয়া গিয়াছে, তবু বহু বৎসর যাবৎ সেই পুঁজিপতি ধনিকই কারখানার মালিক এবং সে যুগযুগান্ত শ্রমিককে শোষণ করিয়া চলিতেছে। যদি কেহ কখনও ইহার বিরোধিতা করে, তাহা হইলে সেই জমিদারের চাকরের মত তাহাকেও পুলিশের হাতে পড়িতে হইবে। আর সকলের চাইতে আশ্চর্য্য এই যে, যদিও চাকরের উপর জমিদারের ব্যবহার বর্ত্তমানে সকল লোকের নিকটই অন্যায় জুলুম বলিয়া মনে হয়, কিন্তু আজিকার দিনে ধনিকদের হাতেই শাসন-যন্ত্র বলিয়া ধনিকদের এই লাভ করাটা বড় কেহ অন্যায় মনে করে না (ঠিক যেমন সামন্ততান্ত্রিক যুগে চাকর রাখাও খুব কম লোকেই অন্যায় মনে করিত)। অনেক চা-বাগান বা চট-কলের মালিক তাহাদের মূল পুঁজির শতগুণ পরিমাণ লাভ করিয়াছে; তাই বলিয়া যদি সেই চা-বাগান বা চট-কলের কুলিরা দাবী করিয়া বসে যে এখন আর

বাগান বা কলগুলির উপর মালিকদের কোনও অধিকার নাই, তাহাদের পাওনা চুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এইগুলি এখন ন্যায়তঃ কুলিদেরই সম্পত্তি তাহা হইলে অনেকেই হাসিয়া উড়াইয়া দিবে; অথচ আমরা দেখিলাম প্রকৃত পক্ষে ইহাই সত্য। সুদখোর মহাজনের চক্রবৃদ্ধিহারে শতকরা তিনশত টাকা সুদ নেওয়া যত বড় সামাজিক অন্যায়, ধনিক সমাজের মুনাফাটা তাহার চাইতে কোন ক্রমেই ভাল নয়। খাতক তবু আশা করিতে পারে একদিন এই সুদ সে পরিশোধ করিতে পারিবে, অন্ততঃ আইনতঃ তাহার এই অধিকার আছে (যদিও কার্য্যতঃ খুব কম ক্ষেত্রেই ইহা সম্ভবপর হয়), কিন্তু ধনিক সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর সেইরূপ কোন আইনানুগ অধিকারও নাই যে মালিকের (কলকারখানা প্রভৃতির পুঁজি বাবদ) "দেনা" পরিশোধ করিয়া শ্রমিকশ্রেণীই সমস্ত উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক হইবে।

কাজেই আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, প্রকৃত পক্ষে অন্যকে শোষণ করিয়া লাভ করিবার কাহারও ন্যায়সঙ্গত অধিকার নাই এবং উৎপাদনের উপায়গুলিতে ব্যক্তিগত অধিকারের বিলোপ সাধন করিয়া, ব্যক্তিগত সম্পত্তি উচ্ছেদ করিয়া সামাজিক সম্পত্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত। যুক্তিগুলি সংক্ষেপে এই: প্রথমতঃ ধনিকপ্রথা নিষ্প্রয়োজন এবং প্রতিক্রিয়াশীল। ধনিক-প্রথা লুপ্ত হইলেও সমাজ স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে; বর্ত্তমানে ধনিক প্রথা সর্ব্ব বিষয়েই সকল রকম প্রগতি ও উন্নতির পরিপন্থী। দ্বিতীয়তঃ, দুনিয়ার জনগণের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে, সমাজকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে, ধনিক প্রথা ধ্বংস করিয়া, উৎপাদনের উপায়গুলির উপর ব্যক্তিগত অধিকার লুপ্ত করিয়া সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা ভিন্ন, সমস্ত উৎপাদনের উপায়গুলিকে সমাজ-সম্পত্তিতে পরিণত করা ভিন্ন কোন গত্যন্তর নাই। তৃতীয়তঃ, ধনিক প্রথা অন্যায় ও জোর জুলুমের উপর প্রতিষ্ঠিত; বহুকে বঞ্চিত করিয়া ইহা মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের পুঁজি যোগাইয়াছে। স্বাধীন জনগণকে সম্পত্তি হইতে উৎখাত করিয়া ইহা তাহাদিগকে ধনিক প্রথার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে, অর্থাৎ জনগণকে দিন-

মজুরে পরিণত করিয়াছে, এবং বর্ত্তমান সময়েও ইহা জোরজুলুমের উপরই দাঁড়াইয়া আছে। জনগণকে সম্পত্তি হইতে উৎখাত করিয়াই ধনিক প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ক্রমেই অধিকতর লোককে নিঃস্ব সর্ব্বহারায় পরিণত করিয়া ইহা টিকিয়া থাকিতেছে। ধনিক প্রথা অল্প লোকের জন্য বহুকে সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিয়াছে, সমাজতন্ত্র অনেকের জন্য অল্প কয়েকজনকে (যে কয়েকজন সমস্ত উপাদানের উপায়গুলিকে তাহাদের কয়েকজনের একচেটিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করিয়াছে) ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিবে এবং জনগণকে প্রয়োজন-অনুযায়ী নিজস্ব সম্পত্তি ভোগ করিবার অধিকার ও সুযোগ দিবে।

প্রশ্নমালা

১। ধনতান্ত্রিক শোষণ কি ? মুনাফা কাহাকে বলে ? ইহা কি ভাবে সৃষ্টি হয় ? উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

২। শ্রমিকের মজুরী নির্দ্ধারিত হয় কি ভাবে ?

৩। মালিকদের কি মুনাফা ভোগ করিবার কোন ন্যায্য অধিকারই নাই ? বিশদ আলোচনা কর।

৪। ধনিক প্রথা ধ্বংস করিবার পক্ষে যুক্তি কি কি ?

৫। মূল্য সৃষ্টি হয় কি ভাবে ? সকল প্রয়োজনীয় জিনিষেরই কি মূল্য আছে ?

৬। একই জিনিষের দাম এক সময়ে বেশী অন্য সময়ে কম হয় কেন ?

৭। বিনিময় মূল্য নির্দ্ধারিত হয় কি ভাবে ? কারণগুলি উল্লেখ কর।

বার

যে বিজ্ঞান-সম্মত দার্শনিক ভিত্তির উপর মার্কস্‌বাদ (সাম্যবাদ) দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে বলা হয় "দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ" (Dialectical Materialism)। ইহার কারণ এই যে, মার্কস্‌বাদে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি যে ভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করা হয় তাহা হইল **দ্বন্দ্বমূলক** ; এই ঘটনাগুলি সম্বন্ধে ইহার ধারণা, বিশ্লেষণ ও মতবাদ হইল ভৌতিক বা **বাস্তব** (Material)। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে মার্কসীয় ব্যাখ্যা যেমন দ্বন্দ্বমূলক ও বাস্তব, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে, ইতিহাস ও সমাজ-জীবন সম্বন্ধে ইহার বিচার, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, ধারণা ও মতামত ঠিক তেমন-ই। এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টি ভঙ্গীতে সমাজ-জীবন, সমাজ-ঘটনা ও সমাজ-ইতিহাস অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করাকে বলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে যখন ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তখন তাহাকে বলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism)।

দর্শন হিসাবে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রধান প্রধান বৈশিষ্টগুলি নিয়া আমরা আলোচনা করিব।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলে যে, প্রকৃতি কতকগুলি অসংবদ্ধ, স্ব স্ব স্বাধীন ও সম্বন্ধবিহীন "দৈবাৎ" একত্রিত বস্তুর সমাবেশ নয়। এই মতবাদ অনুযায়ী সমস্ত প্রকৃতি একটি সুসংবদ্ধ একক, ইহার প্রত্যেকটি ঘটনা কার্য্যকারণ নীতিতে আবদ্ধ। কোনও প্রাকৃতিক ঘটনাকেই অন্য ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখিয়া একেবারে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে বিচার করা চলে না, ইহাকে সমগ্র প্রকৃতির

একটি অঙ্গ হিসাবেই বিচার করিতে হইবে। কোনও ঘটনাই "দৈব" (accident) নয়; প্রত্যেক বস্তু ও ঘটনার পিছনে কারণ রহিয়া গিয়াছে। সেই কারণ হয়ত সকল সময়ে আমাদের লক্ষ্যে নাও আসিতে পারে।

প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর পরস্পর নির্ভরশীলতা সময় সময় এতই স্পষ্ট যে কাহাকেও চিন্তা করিয়া সেগুলির কার্য্য কারণ নিরূপণ করিতে হয় না। পৃথিবীতে প্রত্যেকটি ঘটনা অন্যের উপর নির্ভর করে বলিয়াই একক্ষেত্রে যাহা সত্য অন্য ক্ষেত্রে তাহা সত্য নাও হইতে পারে। যেমন, বক্তৃতার স্বাধীনতা সমস্ত রাজনীতিক দলেরই কাম্য। কারণ বক্তৃতার স্বাধীনতা না থাকিলে জনসাধারণ ভাষায় নিজেদের দাবীর রূপ দিতে পারিবে না। কিন্তু কোনও গণতান্ত্রিক দেশে তাই বলিয়া ফ্যাসিস্টদের বক্তৃতার স্বাধীনতা দেওয়া চলে না। কারণ ফ্যাসিস্টরা চায় গণতন্ত্র ধ্বংস করিতে।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ প্রকৃতিকে স্থির, অচঞ্চল ও অপরিবর্ত্তনশীল মনে করে না। এই মতবাদ অনুযায়ী প্রকৃতি সব সময়ই অস্থির, চঞ্চল এবং গতি ও পরিবর্ত্তনশীল। প্রতি মুহূর্ত্তেই কোনও কিছুর উৎপত্তি ও বিকাশ হইতেছে এবং অন্য কোনও কিছুর ক্ষয় ও বিনাশ হইতেছে। কাজেই প্রাকৃতিক ঘটনাকে শুধু পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতার দিক হইতে বিচার করিলেই চলিবে না, ইহাকে অবিরাম গতি, পরিবর্ত্তন, বিকাশ ও বিলুপ্তির দিক হইতেও বিচার করিতে হইবে।

ক্রমোন্নতি অনেক সময় আসে হঠাৎ লাফ, প্রচণ্ড আলোড়ন বা বিপ্লবের মধ্য দিয়া, ঘটনার ধারাবাহিক স্রোতের মধ্যে হঠাৎ দারুণ পরিবর্ত্তন ঘটা অসম্ভব নয়; পরিমাণ গত হ্রাসবৃদ্ধি হইতে সহসা দেখা যায় গুণগত পরিবর্ত্তন। কোনও বস্তু, ঘটনাস্রোত, অথবা নির্দ্দিষ্ট কোনও সমাজের ভিতর পরিবর্ত্তনের মূলে থাকে তাহার মধ্যস্থিত বিভিন্ন শক্তি ও ঝোঁকের সঙ্ঘাত এবং দ্বন্দ্ব।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুসারে সমস্ত বস্তু ও প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে অন্তর্বিরোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব নিহিত রহিয়াছে। এই অন্তর্বিরোধ—পুরাতন ও নূতন, অতীত ও ভবিষ্যত, যাহা লুপ্ত হইতেছে তাহা এবং যাহা বিকশিত হইতেছে তাহা,

এইগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব—ইহাই হইল বিবর্ত্তনের মূল কথা। প্রত্যেক বস্তু ও প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে অন্তর্নিহিত এই পরস্পর-বিরোধী গতিগুলির মধ্যে সংগ্রামই সমস্ত পরিবর্ত্তন ও উন্নতির জন্য দায়ী।

এঙ্গেল্‌স্ বলিয়াছেন—"প্রকৃতিই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের পরীক্ষাক্ষেত্র। একথা বলিতেই হইবে যে বর্ত্তমান যুগের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এই পরীক্ষা সমাধানের উপযোগী অতি মূল্যবান উপাদান যথেষ্ট সংখ্যায় যোগাড় করিয়াছে। বিশ্লেষণের ফলে শেষ সিদ্ধান্ত করা চলে যে বিশ্ব-সংসার বাস্তবিকই চলিতেছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী নীতি অনুসারে। তাহার মধ্যে অলৌকিক কিছু নাই।"

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সম্বন্ধে উপরোক্ত কথাগুলি হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সমাজ ঘটনা, সমাজ-জীবন ও সমাজ-ইতিহাস-বিশ্লেষণেও এই দৃষ্টি-ভঙ্গী কতটা প্রয়োজনীয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া বিচার না করিলে ঐতিহাসিক ঠিক ঠিক ভাবে সমাজকে বুঝিতে পারিবেন না, ইতিহাস বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে না, ইতিহাস একটি বিজ্ঞানে পরিণত না হইয়া হইবে কতকগুলি "দৈব" ঘটনার সন্নিবেশ, একেবারে কতকগুলি বাজে কথার হিজিবিজি।

দুনিয়ার কোন ঘটনাই যদি "দৈব" না হয়, যদি সমস্ত ঘটনাই একে অন্যের সহিত সম্পর্কিত ও পরস্পর-নির্ভরশীল হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকটি সমাজ ব্যবস্থা ও আন্দোলনকে বিচার করিবার সময় "ইহা চির সত্য" এইরূপ ধারণা লইয়া বিচার করা চলিবে না, প্রতিটি ঘটনা বিচার করিবার সময় তাহার কারণ খুঁজিতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থাতে দাস-প্রথা অস্বাভাবিক, অর্থহীন এবং একান্ত অন্যায় মনে হয়, কিন্তু আদিম গোষ্ঠী-সমাজ যখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তখনকার অবস্থায় দাস-প্রথা ছিল একটি স্বাভাবিক ঘটনা এবং সমাজ-বিকাশের দিক হইতে ইহা ছিল পূর্ব্ব অবস্থা হইতে অনেক উন্নততর। সামন্ততান্ত্রিক যুগে ধনিকতন্ত্রের দাবী একটি স্বাভাবিক ও বিপ্লবী দাবী, কেন না সামন্ততন্ত্র হইতে ধনিক-গণতন্ত্র একটি উন্নততর অবস্থা; কিন্তু সমাজতন্ত্রের যুগে, ধনিকতন্ত্রের দাবী করিলে তাহা হইবে অস্বাভাবিক, অন্যায় ও বিপ্লব-বিরোধী দাবী, কেন

না সমাজতন্ত্র হইতে ধনিকতন্ত্রে ফিরিয়া যাইবার অর্থ সমাজকে পিছাইয়া দেওয়া, উন্নতি হইতে অবনতি হওয়া। কোনও কিছুকেই চিরদিন মন্দ বা চিরদিন ভাল বলা চলে না। ন্যায় অন্যায় ভাল মন্দ প্রভৃতি সব কিছুই নির্ভর করে স্থান, কাল ও অবস্থার উপর।

যদি অবিরাম পরিবর্ত্তন ও উন্নতিই সমাজের রীতি হয়, তাহা হইলে কোনও সমাজ-ব্যবস্থাই "চিরস্থায়ী" নয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শোষণের কোনও "চিরস্থায়ী রীতি" নাই। কাজেই সমাজবিজ্ঞান অনুযায়ী ধনিকপ্রথার পরিবর্ত্তে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর, ঠিক যেমন এক সময়ে সামন্ততন্ত্রের পরিবর্ত্তে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। উপরোক্ত কারণেই, যে শক্তি উন্নতির দিকে চলিয়াছে, যাহার সম্মুখে ভবিষ্যৎ রহিয়াছে, সেই শক্তির উপরই আমরা (বিপ্লবীরা) জোর দিব, যদিও বা বর্ত্তমানে সেই শক্তি কম শক্তিশালী হইতে পারে। এই জন্যই ধনিকদেশগুলিতে সাম্যবাদীগণ শ্রমিকশ্রেণীর উপর সব চাইতে বেশী জোর দেয়। সম্মুখে চলাই বিজ্ঞান-সম্মত রীতি, পিছনে ফিরা নয়।

যদি পরিমাণগত ধীরগতি ক্রম-পরিবর্ত্তন হইতে গুণগত হঠাৎ পরিবর্ত্তনই বিকাশের রীতি হয়, তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে নির্য্যাতিত শ্রেণীগুলি যে বিপ্লব করে তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী ঘটনা, তাহা এড়ান চলে না। কাজেই ধীরগতি ক্রমপরিবর্ত্তন দ্বারা ধনিকতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্রে পৌছান সম্ভবপর নয়; এইভাবে সংস্কার দ্বারা ধনিকসমাজের দাসত্ব হইতে শ্রমজীবীগণ মুক্তি পাইবে না, এই মুক্তির জন্য প্রয়োজন গুণগত হঠাৎ পরিবর্ত্তন অর্থাৎ বিপ্লব। সুতরাং, বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে চলিতে হইলে সকলকে বিপ্লবী হইতে হইবে, সংস্কার-পন্থী হইলে চলিবে না।

অধিকন্তু সমাজের গতি যদি হয় দ্বন্দ্বমূলক, পরস্পর-বিরোধী শক্তির মধ্যে সংঘাতই যদি সমাজবিকাশের গোড়ার কথা, তাহা হইলে শ্রেণীসংগ্রাম খুবই স্বাভাবিক এবং অনিবার্য্য ঘটনা, ইহা ঘটিবেই ঘাটিবে। কাজেই, সমাজের গলদগুলিকে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করা বা শ্রেণী সংগ্রামে বাধা দেওয়া খুবই

ভুল। বরং সমাজের গলদগুলি প্রকাশ করিয়া শ্রেণী সংগ্রামকে তাহার পরিণতির দিকে, বিপ্লবের দিকে অগ্রসর করিয়া নেওয়াই হইবে আমাদের বিজ্ঞান-সম্মত কর্ত্তব্য।

উপরের কথাগুলিই হইল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ; দর্শন হিসাবে ইহা ভাববাদের ঠিক উল্টা। এই মতবাদ অনুযায়ী দুনিয়ার প্রকৃতি হইল বাস্তব বা ভৌতিক, গতিশীল বস্তুই দুনিয়ার সকল রকম ঘটনার মূল এবং পরস্পর-সম্পর্ক ও নির্ভরতা এই গতিশীল বস্তুর বিকাশের রীতি। ভাববাদ অনুসারে আমাদের মনই একমাত্র বাস্তব জিনিষ; ইহারই শুধু অস্তিত্ব আছে; আর যে সব কিছু —ভৌতিক জগত, স্থিতি (being), প্রকৃতি—এইগুলির অস্তিত্ব শুধু আমাদের মনেই আছে অর্থাৎ এইগুলি খাঁটি জিনিষ নয়; যেহেতু আমরা মনে করি, আমরা চিন্তা করি যে, এইগুলি আছে শুধু সেইজন্যই এইগুলির অস্তিত্ব আছে; ভৌতিক জগতের অস্তিত্ব আমাদের মন ও চিন্তার উপর নির্ভর করে।

আর, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন অনুসারে বস্তু (matter), প্রকৃতির (nature), স্থিতি হইল একমাত্র বাস্তব বা খাঁটি সত্য (objective truth)। আমাদের মন (mind) বা চিন্তার (thought) উপর ইহা নির্ভর করে না, আমাদের মন বা চিন্তার বাহিরে ইহার স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব রহিয়াছে; বস্তুই হইল মূল পদার্থ; ইহা সমস্ত অনুভূতি, চিন্তা ও মনের উৎপত্তির উপাদান, অর্থাৎ বস্তু হইতেই অনুভূতি, চিন্তা ও মনের উৎপত্তি, মন বস্তু ও স্থিতির প্রতিফলন। চিন্তা ও মনের উৎপত্তিস্থল মগজ এবং মগজ বিবর্ত্তনের ফলে অতি উন্নত বস্তু ভিন্ন কিছু নয়, ইহা বস্তুর চরম বিকাশ; কাজেই চিন্তাকে বস্তু হইতে ভিন্ন করা সম্ভবপর নয়। এঙ্গেল্‌স্‌ বলিয়াছেন, "আমরা যে ভৌতিক (বাস্তব) ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য (যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা উপলব্ধি করা যায়) দুনিয়াতে বাস করি তাহাই একমাত্র সত্য......। আমাদের চেতনা ও চিন্তা, তাহা যতই অতীন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয় বহির্ভূত) মনে হউক না কেন, উহা প্রকৃত পক্ষে একটি ভৌতিক, শারীরিক অঙ্গ—মগজ হইতে উৎপন্ন। মন হইতে বস্তুর উৎপত্তি হয় নাই, পরন্তু মন হইল বস্তুরই সর্ব্বোত্তম সৃষ্টি।" এই সম্বন্ধে মার্কস্‌ বলিয়াছেন, চিন্তাশীল বস্তু

হইতে চিন্তাকে বিভক্ত করা অসম্ভব", অন্যত্র, "বস্তু কি ভাবে চলে এবং কি ভাবে ইহা চিন্তা করে তাহার ছবিই হইতেছে দুনিয়ার ছবি।"

ভাববাদ অনুযায়ী প্রকৃতি ও তাহার বিধান সমূহ অজ্ঞেয়, ইহা আমাদের জ্ঞানের নিশ্চয়তায় বিশ্বাস করে না, বাস্তব সত্য বলিয়া কিছু স্বীকার করে না। এই মত অনুযায়ী প্রকৃতি এমন কতকগুলি স্ব-স্বাধীন জিনিষে (things-in-themselves) পূর্ণ, যাহা বুঝিয়া উঠা বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। মার্কসীয় দর্শনের মতে প্রকৃতি ও তাহার বিধানাবলী সম্পূর্ণভাবেই জ্ঞেয়, প্রকৃতির নিয়মাবলী সম্বন্ধে পরীক্ষা (experiment) ও ব্যবহার লব্ধ যে সকল জ্ঞান আমরা অর্জ্জন করি তাহাই সঠিক (authentic knowledge), ও বাস্তব সত্য। দুনিয়াতে অজ্ঞেয় নামে কোনও জিনিষ নাই; এমন কতকগুলি জিনিষ আছে যাহা এখনও বুঝা যায় নাই, বিজ্ঞানের চেষ্টা ও ব্যবহারের ফলে এইগুলিও জানা এবং বুঝা যাইবে।

উপরোক্ত কথাগুলিই মার্কসীয় বস্তুবাদী দর্শনের মূল কথা।

উল্লিখিত দার্শনিক সত্যগুলিকে যদি আমরা সমাজের ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি, তাহা হইলে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুযায়ী, সমাজের ইতিহাসটা কতকগুলি "দৈব" ঘটনার সমাবেশ নয়, ইহা রীতিমত নির্দ্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী চলিতেছে। ইতিহাসের কাজ হইল সমাজ-বিকাশের এই বিধানগুলি ভালভাবে অনুধাবন করা এবং তাহা হইতে ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত ও তথ্য (deductions) বাহির করা। দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বিজ্ঞান ও বাস্তব কর্ম্মধারার, মতবাদ ও বাস্তব আচরণের এক নিপুণ সংমিশ্রণ। ইহারা পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, এই সম্বন্ধে স্ট্যালিন বলিয়াছেন, "মতবাদ ছাড়া বাস্তব আচরণ অন্ধ এবং বাস্তব আচরণ ভিন্ন মতবাদ বন্ধ্যা।"

যে-হেতু বস্তু হইতে, ভৌতিক জগত হইতে, মন ও চিন্তার উৎপত্তি, মন বাস্তব সত্যের প্রতিফলন, তাই ভৌতিক (material) সমাজ-জীবন হইতে আধ্যাত্মিক (spri:ual) সমাজ-জীবনের সৃষ্টি; আধ্যাত্মিক সমাজ-জীবন ভৌতিক সত্যের, স্থিতির প্রতিফলন ভিন্ন কিছুই নয়। এইজন্যই সমাজের

ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে আমরা বিভিন্ন রকম চিন্তা, ভাবধারা, মতবাদ, আদর্শ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাই, কেননা সমাজ-বিকাশের বিভিন্ন যুগে সমাজের ভৌতিক জীবন বিভিন্ন রকম থাকে। সমাজের স্থিতি, তাহার ভৌতিক জীবনের অবস্থা যেইরূপ, সেই সমাজের চিন্তা, ভাবধারা, মতবাদ, আদর্শ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিও সেইরূপ। ইহারা সকলেই ভৌতিক অবস্থানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলে। মার্কস্'এর ভাষায়, "মানুষের চেতনার উপর তাহার স্থিতি নির্ভর করে না, পক্ষান্তরে মানুষের সামাজিক স্থিতিই তাহার চেতনা নির্দ্ধারিত করে।" কাজেই "স্বাধীন" চিন্তা নামে কোনও জিনিষ নাই, যাহার যেইরূপ খুশী সেইরূপ চিন্তা করিতে পারে না। এই খুশী-মাফিক চিন্তার সঙ্গেও যুগের ভৌতিক অবস্থানের নিশ্চয়ই সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য থাকিবে।

মার্কস্‌বাদের শক্তি ও সজীবতা এইখানেই যে, ইহা সমাজের ভৌতিক জীবনের বিকাশের পক্ষে প্রয়োজন অনুযায়ী ইহার বাস্তব কর্ম্মধারা প্রয়োগ করে এবং কখনও সমাজের বাস্তব জীবন হইতে সরিয়া পড়ে না।

মার্কস্‌বাদ সম্বন্ধে কেহ যেন এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা করিয়া না বসেন যে, এই মতবাদ অনুযায়ী আধ্যাত্মিক সমাজ-জীবনের, অর্থাৎ সামাজিক চিন্তা, ভাবধারা, মতবাদ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের কোনও নিজস্ব বিশেষত্ব নাই, ইহারা কেবল সমাজ জীবনের ভৌতিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, ইহারা পাল্টা সামাজিক স্থিতি, সমাজ-জীবনের ভৌতিক অবস্থার বিকাশকে প্রভাবান্বিত করে না। আমরা সমাজের চিন্তা, ভাবধারা, মতবাদ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপত্তির কথা, তাহারা কি ভাবে আবির্ভূত হয়, তাহাই আলোচনা করিয়াছি এবং উল্লেখ করিয়াছি যে, সমাজের আধ্যাত্মিক জীবন তাহার ভৌতিক জীবনের অবস্থা সমূহের প্রতিফলন মাত্র। সমাজের আধ্যাত্মিক জীবন, তাহার চিন্তা, ভাবধারা, মতবাদ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশেষত্ব ও গুরুত্ব এই যে, ইহারাই কেবল সমাজের ভৌতিক জীবন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না, ইহারা আবার পাল্টা সমাজের ভৌতিক জীবন ও ইতিহাসকেও প্রভাবান্বিত করে। এইরূপে, সমাজের নূতন চিন্তা, মতবাদ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ—সমাজের

ভৌতিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা হইতে ও সমাজের স্থিতির বিকাশের প্রয়োজনীয়তা হইতে যে-গুলির উৎপত্তি—সেইগুলি সমাজের স্থিতিকে, সমাজের ভৌতিক জীবনকে প্রভাবান্বিত করিয়া সমাজের ভৌতিক জীবনের আরও উন্নতি এবং বিকাশের উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি করে। সামাজিক স্থিতি ও সমাজ-চেতনার মধ্যে, সমাজের ভৌতিক জীবনের বিকাশের অবস্থা ও সমাজের আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশের মধ্যে ইহাই হইল সম্বন্ধ।

সমাজের ভৌতিক জীবনের যে অবস্থা শেষ পর্যন্ত সমাজের আধ্যাত্মিক জীবনকে, সমাজের চিন্তা, আদর্শ, ভাবধারা, মতবাদ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রভৃতিকে গঠন করে—ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুযায়ী এই "সমাজের ভৌতিক জীবনের অবস্থাগুলি" (Conditions of material life of Society) কি ?

এই কথা সত্য যে, প্রকৃতি (যাহা সমাজকে আবেষ্টন করিয়া আছে), ভৌগোলিক অবস্থান এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধি—এইগুলি সমাজের ভৌতিক জীবনের অবস্থার মধ্যে পড়ে এবং ইহারা সমাজকে কিছুটা প্রভাবান্বিতও যে না করে তাহা নহে ; কিন্তু সমাজের ইতিহাস এইটুকু পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, এইগুলির প্রভাব মীমাংসাকারী চূড়ান্ত প্রভাব নয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুযায়ী মীমাংসাকারী (determining) শক্তি হইল মানুষের অস্তিত্বরক্ষা করিবার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় "জীবন ধারণের উপায় অর্জ্জন করিবার প্রণালী" (method of procuring the means of life)—যে সব বস্তু সমাজ-জীবন ও তাহার বিকাশের জন্য অনিবার্য্যরূপে দরকার সেই ভৌতিক বস্তু-উৎপাদন-পদ্ধতি (method of production of material values)। উৎপাদন যন্ত্র (instrument of production) এবং যাহারা এই যন্ত্র ব্যবহার করে সেই শ্রমিক—এই দুইটি শক্তি একত্র হইয়া সমাজের উৎপাদন-শক্তি (forces of production) বা উৎপাদনের উপায় (means of production) গঠন করে। উৎপাদন-শক্তির বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা বেশী দিন এক অবস্থায় থাকে না। বিকাশের বিভিন্ন স্তরে মানুষ বিভিন্ন রকম উৎপাদনের উপায় ব্যবহার করে, বিভিন্নভাবে জীবন যাপন করে ; তারই সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমাজ-ব্যবস্থা, তাহার

আধ্যাত্মিক জীবন, চিন্তা, আদর্শ, ভাবধারা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহও বিভিন্ন রূপ নেয়। সোজা কথায় মানুষের জীবন যাপনের রীতি যেমন, তাহার চিন্তার ধারাও তেমনই। সমাজ-বিকাশের ইতিহাস হইল সমাজের উৎপাদনের উন্নতির ইতিহাস, উৎপাদনের উপায়গুলি এবং ইহাদের ভিতর দিয়া মানুষের পরস্পর পরস্পরের মধ্যে যে উৎপাদন-সম্বন্ধ স্থাপিত হয় সেইগুলির ক্রমবিকাশের ইতিহাস।

কাজেই, সমাজের ইতিহাসকে বুঝিতে হইলে, ইহার নিয়মাবলী সংগ্রহ করিতে হইলে তাহা মানুষের মন ও সমাজের চিন্তাধারা প্রভৃতির ভিতর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। ইহা খুঁজিতে হইবে সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা মধ্যে, সমাজের অর্থ নৈতিক জীবনের ভিতর।

প্রথমে সমাজের উৎপাদন-শক্তিগুলির পরিবর্ত্তন ও বিকাশ হয় এবং পরে ইহারই উপর নির্ভর করিয়া এবং ইহার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া মানুষের উৎপাদন সম্পর্ক, অর্থ নৈতিক সম্পর্ক, পরিবর্ত্তিত হয়। উৎপাদন-সম্পর্ক যখন উৎপাদন-শক্তিগুলির বিকাশের পক্ষে বাধা হইয়া দাঁড়ায়, তখন বিপ্লবের মধ্য দিয়া দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়; উৎপাদন-সম্পর্ক খুব বেশী দিন উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিকাশের পিছনে পড়িয়া থাকিতে পারে না; শেষ পর্য্যন্ত উৎপাদন-শক্তিগুলি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে নিশ্চয়ই সামঞ্জস্য স্থাপিত হইবে।

প্রশ্নমালা

১। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ কি? ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কাহাকে বলে? ইহাদের সম্বন্ধে প্রধান প্রধান কথাগুলি উল্লেখ কর।

২। "শেষ বিশ্লেষণে প্রকৃতির গতি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী"—উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

৩। "ন্যায় অন্যায়, ভাল মন্দ প্রভৃতি সব কিছুই নির্ভর করে স্থান, কাল ও অবস্থার উপর"—কয়েকটি উদাহরণ দেখাও।

৪। ধনিক দেশগুলিতে সাম্যবাদীগণ শ্রমিক শ্রেণীর উপর সব চাইতে বেশী জোর দেয় কেন?

৫। "বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে চলিতে হইলে সকলকে বিপ্লবী হইতে হইবে, সংস্কারপন্থী হইলে চলিবে না।" দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুযায়ী ব্যাখ্যা কর।

৬। দর্শন হিসাবে ভাববাদের (Idealism) সঙ্গে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের (Dialectical Materialisn) পার্থক্য কি?—বিস্তারিত আলোচনা কর।

৭। "মন বস্তু ও স্থিতির প্রতিফলন"—ইহা কি সত্য? কারণ উল্লেখ কর।

৮। "মতবাদ ছাড়া বাস্তব আচরণ অন্ধ এবং বাস্তব আচরণ ছাড়া মতবাদ বন্ধ্যা"—বিশ্লেষণ কর।

৯। "আধ্যাত্মিক সমাজ-জীবন ভৌতিক সত্যের স্থিতির প্রতিফলন"—ভালভাবে বুঝাও।

১০। আধ্যাত্মিক সমাজ-জীবনের গুরুত্ব ও বিশেষত্ব কি? ইহা কি সমাজের ভৌতিক জীবনকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে? সমাজের ভৌতিক জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কি?

১১। সামাজের উৎপাদন রীতি যেরূপ, সমাজ ও তাহার চিন্তা, আদর্শ, ভাবধারা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহও সেইরূপ। অর্থনীতি সমাজের আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে চূড়ান্ত প্রভাব। ভালভাবে বুঝাও।

১২। "স্বাধীন চিন্তা নামে কোনও জিনিষ নাই…খুশী মাফিক চিন্তার সঙ্গে যুগের ভৌতিক অবস্থানের নিশ্চয়ই সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য থাকিবে।"—উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

১৩। "দৈব" (accident), "ঐশ্বরিক শক্তি" (supernatural power) ও "অতি মানব" (superman) সম্বন্ধে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা কি?



তের

মার্কসীয় দার্শনিক বস্তুবাদ সম্বন্ধে আমরা যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে স্পষ্ট হইয়াছে যে, সাম্যবাদীগণ কোনও আধ্যাত্মবাদে (Spiritualism) বিশ্বাস করে না, কোনও ভাববাদে (Idealism) বা ধর্ম্মেতে বিশ্বাস করে না, সাম্যবাদীগণ বস্তুবাদী (materialist), তাহাদের মতে এই দুনিয়াটাই বাস্তব সত্য, ইহার বাহিরে কোনও সত্য নাই।

দুনিয়াটাই যদি বাস্তব সত্য হয়, তাহা হইলে ভাববাদের, ধর্ম্মমতের জন্ম হইল কি ভাবে? ধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাদিকে গবেষণা হইবার ফলে সাম্যবাদীগণ মনে করে যে, মানুষের অজ্ঞতা ও অসহায়তাই তাহার মনে অতীন্দ্রিয় (Supernatural) ক্ষমতা সমন্ধে ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে মানুষ যাহা কিছু বুঝিতে পারিত না, জানিতে পারিত না, তাহাই সে অজ্ঞের মত, দৈব বা ঐশ্বরিক বলিয়া মনে করিত। এইগুলি সম্বন্ধে, বিস্ময়, ভয় ও বিহ্বলতা হইতে তাহার মনে ধর্ম্মভাব জাগ্রত হয় এবং এই-গুলিকে খুশী করিবার জন্য মানুষ এইগুলিকে বা ইহাদের কাল্পনিক চালক বা চালকগণকে পূজার্চ্চনা করিতে সুরু করে। এইভাবেই আদিম যুগে সূর্য্য, অগ্নি, ঝড়, বিদ্যুৎ প্রভৃতি সম্বন্ধে অতীন্দ্রিয় ধারণার সৃষ্টি হয়। যাহা কিছু বিরাট এবং মহৎ, যাহা তাহার আয়ত্তের মধ্যে নয়, যে সকল জিনিষ তাহার জীবন ধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় অথচ যেইগুলি সে নিজে সৃষ্টি করিতে পারে না, সেই সকল শক্তি সম্বন্ধেও তাহার একটা ঐশ্বরিক ধারণা হয়। এই ভাবেই নদী, পর্ব্বত, বৃষ্টি, গরু প্রভৃতি দেবতার আসন গ্রহণ

করে। যে সকল জিনিষ অসীম ক্ষমতাশীল, যাহার চালচলন মানুষ সহজে বুঝিতে পারিত না এবং যাহা মানুষকে প্রায়ই কাবু করিত, এই জাতীয় জিনিষও অনেক ক্ষেত্রে ঐশ্বরিক আখ্যা পায়; অসভ্য মানুষের মধ্যে নানারকম মহামারী দেবতার পূজা, সাপ বাঘ প্রভৃতির পূজা এই ভাবেই আসে। ইহা ছাড়া অন্যের উপর, বিশেষতঃ বাপ-মায়ের উপর, নির্ভর করিবার সহজাত অভ্যাস (instinct) হইতেও পরমপিতা, পরমমাতা (যাহারা বিপদাপদে রক্ষা করিবে) জাতীয় অতি-প্রাকৃতিক ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে।

বিজ্ঞানের ক্রমাগত উন্নতির ফলে মানুষ অনেক প্রাকৃতিক ঘটনাবলীই বুঝিতে পারে এবং প্রাকৃতিক শক্তিকে অনেকটা তাহার আয়ত্তে আনে। কিন্তু সমাজ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আবার এমন কতকগুলি সমাজশক্তি দাঁড়াইয়া যায়, যাহা লোকের নিকট একেবারেই অবোধ্য। আদিম যুগে মানুষ শিকার বা চাষবাস করিয়া এক রকম নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করিত—একমাত্র ঝড়-বৃষ্টির গোলমাল, মড়ক প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি সময়ে সময়ে বাধাস্বরূপ দাঁড়াইত। তাই এইগুলি হইয়া পড়িয়াছিল "দৈব" শক্তি। সমাজ বিকাশের সঙ্গে এইগুলি আয়ত্তে আসিতে লাগিল সত্য, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি সৃষ্টির সঙ্গে অন্য রকম শক্তি—সামাজ-শক্তি—মানুষের জীবনে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিল। এখন আর পরিশ্রম করিলেই নিশ্চিত সুখের জীবন যাপন করা চলে না। কেহ হয়ত অনেকটা পরিশ্রম করিয়াও কষ্টকর পরাধীন জীবন যাপন করে আর কেহ কেহ বিনা পরিশ্রমে পরমসুখে দিনাতিপাত করিতে পারে। ব্যবসা বাণিজ্য সুরু হইবার পর, আজ যে ধনী, দুইদিন পরে ঘটনাচক্রে সে হয়ত হইল দীন-ভিখারী। এই সকল কারণগুলি মানুষ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, অথচ এইগুলি তাহার জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা। তাই সৃষ্টি হইল অদৃষ্টবাদের। বর্ত্তমান ধনিক জগতে দেখি একদিকে "অতিরিক্ত উৎপাদন" আর একদিকে নিদারুণ অভাব—যাহাকে বলা হয় পর্য্যাপ্ততা এবং অভাবের হেঁয়ালী। ইহাকে বিধির বিধানই বলিয়া মনে হয়।

মানুষের মনে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিস্ময়, ভয় ও বিহ্বলতার সুযোগ নিয়া সমাজের শাসক ও শোষক শ্রেণী এই ধর্ম্মভাবকে নিজেদের সুবিধার্থে ব্যবহার করে এবং ক্রমে প্রচলিত ধর্ম্মের বিধানগুলি হইয়া পড়ে শোষণের বিধান। নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্মের সহায়তা ভিন্ন শাসন চালান সম্ভবপর নয়।" প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মের নামে সমাজে দুর্ব্বলের উপর সবলের যেমন অত্যাচার চলিয়াছে, দরিদ্রের উপর ধনীর যেমন শোষণ চলিয়াছে, এমন আর কোন মতেই সম্ভবপর হয় নাই। ইহা মানুষের মনে সংস্কারের মোহ সৃষ্টি করিয়াছে, মানুষকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে মানুষকে অজ্ঞ রাখিবার, ভুল বুঝাইবার ইহা হইল প্রকৃষ্ট যন্ত্র। মার্কস্'এর কথায়— "ধর্ম্মকে যেমন করা হইয়াছে আত্মাহীন ঘটনাবলীর আত্মা, তেমন ইহা হইল নিপীড়িত জীবের দীর্ঘশ্বাস (সান্ত্বনা), হৃদয়হীন (নির্ম্মম) দুনিয়ার হৃদয় (শান্তি)। জনসাধারণের জন্য ইহা আফিম।" এইজন্যই শোষক ও শাসকগণ জনসাধারণের মনে ধর্ম্মের সংস্কার জাগাইয়া রাখিবার জন্য তাহাদের রাষ্ট্রীয় শক্তি ও প্রচার-যন্ত্রকে নানাভাবে নিয়োগ করে।

যেহেতু মানুষের অজ্ঞতাই ধর্ম্মের ভিত্তি, তাই যতদিন পর্য্যন্ত মানুষের এই অজ্ঞতা দূর না হয়, ততদিন ধর্ম্ম ভাব কাটিতে পারে না, জোরজুলুম করিয়া ইহা দূর করা যায় না। দুনিয়া অজ্ঞেয় নয় এইকথা সত্য, কিন্তু এখনও অনেক জিনিষ আছে যাহা আমরা ভাল ভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই, যাহা আমাদের জ্ঞানের বাহিরে রহিয়া গিয়াছে। জীবন-মৃত্যুই অনেকটা এই জাতীয় ঘটনা। যদিও ইহা আর এখন রহস্যাবৃত নয়, তবু ইহা এখন পর্য্যন্ত মানুষের আয়ত্তের বাহিরে। মানুষের অজ্ঞতা ও অভাব অভিযোগ দূর হইবার এবং বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-বিশ্বাসও ক্রমে ক্রমে কমিয়া যাইবে। সমাজ-বিকাশের উন্নত স্তরে মানুষ যখন নিশ্চিত সুখ শান্তিতে জীবন যাপন করিবে এবং যখন বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইবে তখন ধর্ম্ম-বিশ্বাসও লোপ পাইবে। উপরোক্ত কারণে সাম্যবাদীগণ জোরজুলুম করিয়া ধর্ম্ম-বিশ্বাস বন্ধ করিবার বিরোধী। ধর্ম্মের অস্তিত্ব, বিলুপ্ত হইবার মত উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি

করিবার জন্য সাম্যবাদীগণ ব্যগ্র। উৎপত্তির কারণগুলি দূর না করিয়া শুধু ধর্মের উপর আক্রমণ চালাইবার অর্থ, ইহার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করা।

সাম্যবাদী মতানুযায়ী সমাজে স্ত্রীলোকদের স্থান কোথায় সেই সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা প্রচার হয়। স্বার্থান্বেষীরা প্রচার করে যে, সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী সমাজে স্ত্রীলোকেরা সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত হইবে। তাহারা হইবে পুরুষের যথেচ্ছ ভোগ-সামগ্রী। অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় ধনিক সমাজে স্ত্রীলোকেরাও পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি; স্ত্রীলোকদের সহিত খেয়াল-মাফিক ব্যবহার করিবার পূর্ণ অধিকার পুরুষের আছে, ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার স্ত্রীলোকদের কোন অধিকার নাই। কাজেই, সমাজতন্ত্রী সাম্যবাদী সমাজে যে-হেতু সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি সমাজ সম্পত্তিতে পরিণত হইবে তাই ধনিকদের পক্ষে এইরূপ ধারণা করা স্বাভাবিক যে, স্ত্রীলোকেরাও পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে সমাজ-সম্পত্তিতে পরিণত হইবে। কিন্তু সাম্যবাদীগণ স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষের শোষণ করিবার সম্পত্তি মনে করে না, তাহারা মনে করে না যে পুরুষের খেয়াল চরিতার্থ করাই স্ত্রীলোকের জীবনের একমাত্র সার্থকতা। সাম্যবাদীগণ পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে সমান অধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে, কেন না তাহারা মনে করে যে, স্ত্রীলোকেরাও মানুষ, পুরুষের অস্থাবর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে শুধু পুরুষেরই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকিবে না, স্ত্রীলোকদিগেরও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকিবে। পুরাতনপন্থীরা হয়ত আঁৎকাইয়া উঠিবেন, তাহা হইলে "সমাজের সুখ, শান্তি, প্রেম, মাধুর্য্য, সব কিছুই গোল্লায় যাইবে।" প্রকৃত পক্ষে, অন্যকে শোষণ করিয়া যে সুখ এবং অন্যকে অত্যাচার করিবার মধ্যে যে শান্তি তাহা নিশ্চয়ই দূর হইবে; আর সমানে সমানে না হইলে উচ্চ নীচের মধ্যে, প্রভু ভৃত্যের মধ্যে কি প্রকৃত প্রেম সম্ভবপর? এবং যে সমাজে স্ত্রীলোকের উপর শোষণ, অত্যাচার ও জুলুম বিদ্যমান সেই সমাজে মাধুর্য্য কোথায়?

স্ত্রীলোক যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবন ধারণের জন্য পুরুষের উপর নির্ভরশীল থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সুখ শান্তি সমস্ত কিছুই হইবে নির্ভরশীল, পুরুষের খুশী মাফিক। পুরুষের উপার্জ্জনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইবার ফলে স্ত্রীলোককে যে বহুরকম শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শোষণ, অত্যাচার, অবিচার ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, সমাজে যদি সকলেই শিক্ষিত হয় তাহা হইলেই এই গলদ দূর হইবে। এই ধারণা আংশিক সত্য মাত্র। পরমুখাপেক্ষী, অধীনস্থ লোক যে সদ্ব্যবহার পাইবে, তাহার উপর যে কোন প্রকার জুলুম চলিবে না, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? শিক্ষিত ধনিক কি তাহার অধীনস্থ কর্ম্মীদিগকে শোষণ করে না, শিক্ষিত স্বামীকে কি স্ত্রীর উপর অত্যাচার ও জুলুম করিতে দেখা যায় না? স্ত্রী যদি আত্মনির্ভরশীল না হয়, তাহার যদি আর্থিক স্বাধীনতা না থাকে; তাহা হইলে তাহাকে স্বামীর ইচ্ছা অনুসারেই চলিতে হইবে, সেই ইচ্ছা তাহার মতের সহিত মিলিতেও পারে আবার তাহার মতের বিরুদ্ধেও হইতে পারে। সেই ইচ্ছা তাহার পক্ষে ভাল হইতেও পারে আবার ভাল নাও হইতে পারে—এই সম্বন্ধে কোনও নিশ্চয়তা নাই। অবিবাহিতা মেয়েদের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে; তাহারা তাহাদের পিতা বা ভ্রাতার উপর নির্ভরশীল এবং পিতা বা ভ্রাতার ইচ্ছাই তাহাদের ইচ্ছা। আর, যাহারা বিধবা বা স্বামী-পরিত্যক্তা, তাহারা ত স্বাভাবিক মানুষ বলিয়াই গণ্য নয়।

স্ত্রী-পুরুষের আর্থিক স্বাধীনতা ও সমান অধিকারের ভিত্তিতে সোভিয়েট ইউনিয়ানে যে নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে, সেখানে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যে ন্যায় ও মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে একটু খোঁজ নিলেই আমরা স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিব, সমাজতন্ত্রী সমাজে স্ত্রীলোকদের স্থান কোথায় এবং সেই সমাজ কত উন্নত। সমান অধিকার, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সুশিক্ষার ফলে সেখানে বেশ্যাবৃত্তি বিলুপ্ত হইয়াছে এবং সমাজে উভয়েরই অধিকার ও স্থান সমান হইবার ফলে সেখানে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রকৃত প্রেম সম্ভবপর হইতেছে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র সমাজের শিশুদের ভার গ্রহণ করিবে। এইজন্য ধনিকরা প্রচার করে যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে জনগণকে পারিবারিক সুখ হইতে বঞ্চিত করা হইবে। দুঃস্থ পরিবারে (এবং বর্ত্তমানে ধনিক সমাজে এইরূপ পরিবারই বেশীর ভাগ) বাপ মা যখন তাহাদের ছেলে মেয়েদের ভরণপোষণ করিতে পারে না, তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে না, অভাব, অনাহার ও রোগে যখন ছেলেমেয়েগুলি কঙ্কালসার হইয়া পড়ে এবং মারা যায়, তখন বাপ মা কিরূপ পারিবারিক সুখ ভোগ করে তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। গরীব বাপ মা ছেলেমেয়ের পিছনে কতটুকু সময় দিতে পারে? বাপ মায়ের আদর পাইবার জন্য যখন ছেলে মেয়েগুলি তাহাদিগকে বিরক্ত করে, তখন শিশুগুলিকে বরং সাজাই পাইতে হয়। শিল্প-অঞ্চলে শ্রমিকদের শিশুগুলিকে যে তাহাদের বাপ মা আফিম জল খাওয়াইয়া ঘরে রাখিয়া কাজে যায়, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। আর, ধনিকদের মধ্যে কয়জন বাপ মা নিজেরা ছেলে মেয়েদের লালন পালন করে? বাপ মা বিলাস ব্যসনে ব্যস্ত থাকায় ধাই বা পরে শিক্ষয়িত্রীই হয় ইহাদের প্রকৃত বাপ মা। সমাজ শিশুদের ভরণ পোষণ স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবার ফলে যখন স্বাস্থ্যবান সুসন্তান গড়িয়া উঠিবে, তখন প্রত্যেক বাপমাই আনন্দিত ও গর্ব্বিত হইবে। ইহাতে তাহাদের পারিবারিক সুখ শান্তি বৃদ্ধি পাইবে, কোনও বাপমায়ের ইহাতে আপত্তি থাকিবার কথা নয়।

আমরা দেখিয়াছি যে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুযায়ী একমাত্র বিপ্লবের ভিতর দিয়াই সমাজের পরিবর্ত্তন হইতে পারে, সংস্কারের ভিতর দিয়া ইহা সম্ভবপর নয়। এবং আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, সমাজ-বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী, ইহা একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। উপরোক্ত কারণে আমাদের মনে দুইটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। প্রথমতঃ সমাজ-বিপ্লব যদি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা হয়, তাহা হইলে ইহার জন্য চেষ্টা করিবার প্রয়োজনীয়তা কি, বিপ্লবী পার্টি গড়িবার সার্থকতাই বা কোথায়? যে-হেতু ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুযায়ী বিপ্লব একটি বৈজ্ঞানিক সত্য,

তাই ইহা কি আপনা হইতে আসিবে না? দ্বিতীয়তঃ, বিপ্লব যে হিংসাত্মকই হইবে এমন কি কথা আছে? ইহা কি অহিংস ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সাধিত হইতে পারে না?

বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী এই কথার অর্থ ইহা নয় যে, মানুষ হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিলেও বিপ্লব সাধিত হইবে। এই কথার অর্থ ইহাই যে, মানুষ তাহার নিজ স্বার্থে বিপ্লবের জন্য চেষ্টা করিতে বাধ্য; সে এইজন্য অন্যকে অনুপ্রাণিত করিবে, সঙ্ঘবদ্ধ করিবে—এইজন্যই বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। সমাজ-বিপ্লব সংগঠিত করিবে মানুষ, কেন না তাহার বাঁচিবার জন্য ইহা একান্ত প্রয়োজন, ইহাতে তাহার প্রকৃত স্বার্থ। তাই বিপ্লবীর কর্ত্তব্য বিপ্লবী-সঙ্ঘ গঠন করা, বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করা—জনগণের ঐকান্তিক চেষ্টা ভিন্ন বিপ্লব আসিবে না, ইহা জয়যুক্ত হইবে না।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের (natural sciences) নিয়মগুলি এইজন্য সত্য যে, প্রাকৃতিক শক্তিগুলি নিয়ম মানিয়া চলে, সেইরূপ সমাজবিজ্ঞানের কতকগুলি (social science) নিয়ম এইজন্য সত্য যে, সমাজশক্তিগুলিও কতকগুলি নিয়ম অনুযায়ী চলে। যেমন কতকগুলি প্রাকৃতিক শক্তির একটা বিশিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী চলিবার ফলে সূর্য্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ বা আরও অনেক রকমের প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে, সেইরূপ কতকগুলি সমাজশক্তি (অর্থাৎ মানুষ) এক একটা বিশিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী চলে বলিয়া সমাজে বিপ্লব আসে। মানুষ সঙ্ঘ গঠন করিবে, আন্দোলন পরিচালনা করিবে প্রভৃতি কতকগুলি বিশিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী চলিবে বলিয়াই বিপ্লব আসিবে। কিন্তু যে-হেতু সমাজশক্তি (মানুষ) প্রাকৃতিক শক্তিগুলির মত জড় পদার্থ নয়, ইহা জীবন্ত চেতন পদার্থ, সেইজন্য সমাজশক্তির চালচলন প্রাকৃতিক শক্তির চালচলনের মত একেবারে ঠিক ঠিক ভাবে বুঝা কঠিন এবং তাই সমাজবিজ্ঞানকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত সঠিকভাবে (স্থান, কাল প্রভৃতি যথাযথভাবে উল্লেখ করিয়া) নিরূপণ করা সম্ভবপর নয়।

সাম্যবাদীগণ সমাজ-বিপ্লবের জন্য শুধু শুধু হিংসা (violence) প্রয়োগের পক্ষপাতী নয়। কিন্তু তাহারা বিশ্বাস করে যে, অহিংস উপায়ে বিপ্লব সাধিত

হইতে পারে না। হিংসাই শোষক সমাজের ভিত্তি। কাজেই এই হিংসাকে বন্ধ করিতে হইলে পাল্টা হিংসা প্রয়োগ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। শ্রেণী সংগ্রাম এমন ব্যাপার যে, উন্নতিশীল শ্রেণীকে বাঁচিতে হইলে বিরোধী শ্রেণীকে ধ্বংস করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। শোষক-শোষিতের সম্বন্ধ অহি-নকুলের সম্বন্ধের মত, এক-জনের জয় হইলে আর একজনের নিশ্চিত মৃত্যু; দুইজনকেই বাঁচাইয়া রাখিবার কোনও উপায় নাই, কোনও মধ্য পথ নাই। চাষীর স্বার্থ দেখিতে হইলে জমিদারের ক্ষতি করিতেই হইবে, শ্রমিকের স্বার্থ দেখিতে হইলে মালিকের বিরোধিতা করিতেই হইবে। সেইরূপ, জমিদার বা মালিকের স্বার্থ দেখিতে হইলে শেষ পর্য্যন্ত চাষী বা শ্রমিকের ক্ষতি করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। শোষক শোষিতদের স্বার্থের মধ্যে কোনও রফা করা চলে না, একজনের মৃত্যুই অন্যের জীবন, শোষকশ্রেণী ধ্বংস না হইলে শোষিতকেই ধ্বংস হইতে হইবে। স্বেচ্ছায় কেহ মরিতে রাজী হয় না, জীবন রক্ষার জন্য সকলেই শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করে, সমস্ত রকম হিংসাত্মক নীতি অবলম্বন করে। কাজেই, হিংসা ভিন্ন বিপ্লবী পরি-বর্ত্তন সাধিত হইতে পারে না। বর্ত্তমানে ধনিক-ব্যবস্থা পূর্ব্বের প্রত্যেকটি শোষণ ব্যবস্থার মত এই কথার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে। এই ব্যবস্থার প্রতিটি নীতি হিংসাত্মক, ইহা সম্পূর্ণভাবে জোরজুলুমের উপর দাঁড়াইয়া আছে এবং একমাত্র পাল্টা জোরজুলুমই এই ব্যবস্থাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া সুখ-সমৃদ্ধিপূর্ণ শোষণহীন স্বাধীন সমাজ, গড়িয়া তুলিতে পারে। সাম্যবাদীগণ যে হিংসার কথা বলে, তাহা আত্মরক্ষা করিবার জন্য, সমাজের প্রচলিত হিংসাত্মক ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া জনগণকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য। অহিংস উপায়ে সমাজ-বিপ্লব সাধন করা যদি সম্ভবপর হইত, তবে সাম্যবাদীরা খুশী হইত সক-লের চাইতে বেশী, কেন না সখ করিয়া জীবনকে নষ্ট করিতে চাহে কে? কিন্তু অহিংস উপায়ে যখন সমাজকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার কোনই উপায় নাই, সেইজন্য সাম্যবাদীগণ পিছাইয়া থাকে না; হিংসার আতঙ্কে পিছাইয়া পড়াকে সাম্যবাদীগণ কর্ত্তব্যে অবহেলা ও কাপুরুষতাই মনে করে। সাম্যবাদীগণ শান্তিবাদী ইহা সত্য, কিন্তু সেই শান্তি শ্মশানের শান্তি নয়।

বাঁচিয়া থাকিয়া সুখ সম্ভোগ উপভোগ করিবার জন্যই শান্তির প্রয়োজন, তাই শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জোরজুলুম চালাইতেও সাম্যবাদীগণ কুণ্ঠিত নয়। অত্যাচারীর অত্যাচার সহ্য করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিবার মনোবৃত্তিকে সাম্যবাদী-গণ শান্তিপ্রিয়তা বলে না; ইহা দাসসুলভ কাপুরুষতারই নামান্তর, ইহার অর্থ অত্যাচারীকে সাহায্য করা, অত্যাচারের প্রশ্রয় দেওয়া।

অনেকে খুব শ্রেণী-সমন্বয় ও বিশ্বপ্রেমের কথা আওড়ান। কিন্তু যে সমাজে মুষ্টিমেয় ধনিকগণ অগণিত জনগণের উপর শোষণ ও অত্যাচার চালাইতেছে, সেখানে শ্রেণী-সমন্বয় ও বিশ্বপ্রেম প্রচার করাটা অনেকটা মায়াকান্নার মতই শুনায়। শোষক ও শোষিতের মধ্যে কি প্রেম সম্ভবপর? সমাজে বিশ্বপ্রেম প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রথমে তদনুযায়ী অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে, অর্থাৎ সমাজ হইতে শোষণ ও অত্যাচার দূর করিতে হইবে। নতুবা, শ্রেণী-সমন্বয় ও বিশ্বপ্রেমের কথা শোষকদেরই কথা, ইহা শোষিতদিগকে সমাজের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে ভুলাইয়া রাখিবার পক্ষে সহায়ক। এই সমাজে যাঁহারা শ্রেণী-সমন্বয় ও বিশ্বপ্রেম প্রচার করেন, তাঁহারা মানব-শুভাকাঙ্খী নিরীহ কল্পনাবিলাসী নন, তাঁহারা কার্য্যতঃ মানবতার হত্যাকারী শোষণ-প্রথার সমর্থক।

প্রশ্নমালা

১। ধর্ম্ম বিশ্বাসের উৎপত্তি সম্বন্ধে তোমার যুক্তি কি? বিস্তারিত আলোচনা কর।

২। জোরজুলুম করিয়া ধর্ম্মবিশ্বাস দূর করা কি সম্ভবপর? ইহা কি ভাবে দূর হইতে পারে? কেন?

৩। ধর্ম্মকে শোষকশ্রেণী কি ভাবে শোষণের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছে? উদাহরণ দাও।

৪। সমাজতান্ত্রিক সমাজে স্ত্রীলোকদের স্থান কোথায়? ইহাতে কি পারিবারিক শান্তি লোপ পাইবে?

৫। সমাজতান্ত্রিক সমাজ শিশুদের লালনপালনের ভার গ্রহণ করায় জনগণ কি পারিবারিক সুখ হইতে বঞ্চিত হইবে ?

৬। বিপ্লব কি আপনা-আপনিই আসিবে ? কেন ?

৭। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত সমাজ বিজ্ঞানকেও সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভবপর নয় কি ? কারণ দেখাও।

৮। অহিংসা, শান্তি ও বিশ্বপ্রেম সম্বন্ধে সাম্যবাদীদের মতামত কি ?

৯। বিপ্লবের জন্য যে হিংসার প্রয়োজন হয় তাহা আত্মরক্ষার্থ দরকার—বিস্তারিত আলোচনা কর।

চৌদ্দ

আমরা এই পর্য্যন্ত নানারকম সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে এবং কোন্ ব্যবস্থার ভিতর দিয়া কিরূপে বিপ্লব সংগঠিত হয় সেই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। আমাদের কথাগুলি সাধারণভাবে সামন্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য; কিন্তু কতকগুলি দেশ আছে, যেগুলি কোনও না কোনও সাম্রাজ্যবাদী দেশের সাম্রাজ্য বা উপনিবেশ; এই দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদের তৈয়ারী মাল ও পুঁজি চালান দিবার এবং কাঁচামাল যোগাড় করিবার বাজার; এইগুলি সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ক্ষেত্র, এইগুলিকে শোষণ করিয়াই সাম্রাজ্যবাদ টিকিয়া থাকে। সাম্রাজ্যবাদের এই সকল উপনিবেশে যে শাসন-ব্যবস্থা চলিয়াছে তাহাকে কি শাসন ব্যবস্থা বলা হয়, ইহা কোন্ প্রকৃতির এবং এই সকল দেশের জনসাধারণ যে বিপ্লবের সম্মুখীন তাহাই বা কিরূপ? এই সকল বিষয়ে সম্যক ধারণা না থাকিলে সাম্যবাদ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ এবং অস্পষ্ট থাকিয়া যাইবে।

সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশের শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে ফ্যাসিস্ট শাসন ব্যবস্থার যথেষ্ট মিল দেখা যায়। এই সকল দেশে রাষ্ট্র-শাসন ব্যাপারে জনগণের প্রকৃতপক্ষে কোনও ক্ষমতা নাই বলিলেই চলে, জনগণ সর্ব্বপ্রকার নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত, সাম্রাজ্যবাদী শোষক যেভাবে তাহার অধীনস্থ উপনিবেশের শাসন পরিচালনা করা ঠিক মনে করে, সেইভাবেই ইহা পরিচালিত হয়। ফ্যাসিস্ট শাসন-ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদী ধনিকদের শাসন ব্যবস্থারই একটি রূপ, কিন্তু উপনিবেশের শাসনব্যবস্থার মধ্যে তথাকার ধনিকদের কোনও হাত

নাই ; যে সাম্রাজ্যবাদী দেশের অধীনে উপনিবেশটি আছে সেখানকার ধনিকরাই ইহার শাসনের জন্য দায়ী। সমস্ত ছোট খাট ব্যাপারে হুবহু মিল না থাকিলেও সাধারণভাবে প্রত্যেক উপনিবেশের শাসন-ব্যবস্থার বেলাতেই উপরোক্ত কথাগুলি সত্য, এইগুলিই উপনিবেশের শাসনের ভিত্তি। সাম্রাজ্যবাদী শোষকরা যাহাই বলুক না কেন, উপনিবেশের শাসন-ব্যবস্থার একটি ভিন্ন নাম থাকা দরকার, যাহা হইতে আমরা ইহার বিশিষ্টরূপ বুঝিতে পারি। এই ব্যবস্থাকে ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থা আখ্যা দেওয়া মন্দ নয়।

আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, কোনও উপনিবেশের শাসন-ব্যবস্থা কিরূপ হইবে তাহা উক্ত উপনিবেশের মালিক সাম্রাজ্যবাদী ধনিকগণ কর্তৃক তাহাদের নিজেদের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া স্থিরীকৃত হয়। ইহা এমনভাবে ঠিক হয় যাহাতে উপনিবেশকে সাম্রাজ্যবাদের বাজার হিসাবে স্থায়ীভাবে ব্যবহার করা চলে। এই কথা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থায় সেই দেশের জনগণের কোনও স্বার্থ নাই, তাহাদের সকলকে নির্বিঘ্নে শোষণ করাই এই শাসন-ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং উপনিবেশের সমস্ত জনগণই এই সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ-ব্যবস্থার বিরোধী, তাহারা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ।

সাম্রাজ্যবাদী শোষক কোনও দেশ অধিকার করিয়া সেই দেশকে তাহার শোষণের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া নেয়। যে সকল উপনিবেশে ধনিক-ব্যবস্থা বর্ত্তমান ছিল না, সে সকল দেশেও সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের কাজ-কারবার করিতে করিতে তাহাদেরই আওতায় কিছু ধনিক, কিছু কিছু শিল্প-বাণিজ্য এবং কিছু শ্রমিক গড়িয়া উঠে। এই ধনিকশ্রেণী যদিও সাম্রাজ্যবাদের আওতাতেই গড়িয়া উঠে, তবু ধনতন্ত্রের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ইহাও উত্তরোত্তর প্রসার কামনা করে। কিন্তু যদিও সাম্রাজ্যবাদই তাহার প্রয়োজনের জন্য উপনিবেশে ধনিকশ্রেণীর সৃষ্টি করে, তথাপি সাম্রাজ্যবাদ ইহার প্রসার সহ্য করিতে পারে না, কেন না উন্নতিশীল দেশীয় ধনিকশ্রেণী প্রতি-দ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায় এবং পরস্পর স্বার্থের সংঘাত ঘটাতে তাহাদের বিরোধিতা

করে। এইজন্য প্রথম হইতেই সাম্রাজ্যবাদ তাহার উপনিবেশে কতকগুলি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে বাঁচাইয়া রাখে বা প্রয়োজন বোধে সৃষ্টিও করে। সে শক্তিগুলিকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সব সময়েই সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং কাজে কাজেই সে শক্তিগুলি উপনিবেশের ভিতর সব সময়েই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং সাম্রাজ্যবাদের স্থায়ী সমর্থক হিসাবে কাজ করে (যেমন, আমাদের দেশের সামন্ত-নৃপতিগণ ও জমিদারগণ)। আর সাম্রাজ্যবাদ সব সময়েই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে, যাহাতে উপনিবেশের ধনিকগণ কোনও জাতিগঠনকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠার সুযোগ না পায়। নানা রকম আইন-কানুন ও বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশের শিল্প বাণিজ্যকে পঙ্গু ও সাম্রাজ্যবাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করিয়া রাখে। যেরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে উপনিবেশ সাম্রাজ্যবাদের আওতা এড়াইয়া তাহার সহযোগিতা ছাড়া নিজেই স্বাধীনভাবে চলিতে পারে, সাম্রাজ্যবাদ কখনও উপনিবেশের ধনিক-দিগকে সেরূপ শিল্প গড়িতে দিতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে, সাম্রাজ্য-বাদ আর সাম্রাজ্যবাদ থাকিতে পারে না। ফলতঃ উপনিবেশগুলি সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের এক অদ্ভুত রকমের মিশ্রণ হইয়া পড়ে।

উপনিবেশের মধ্যে, সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া সমগ্র জনগণ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী থাকে। সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণ ধ্বংস করিয়া স্বদেশকে স্বাধীন করায় দেশীয় ধনিক, মধ্যবিত্ত, চাষী ও শ্রমিক ইহাদের প্রত্যেকেরই স্বার্থ। উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে মুষ্টিমেয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ছাড়া জাতির সমস্ত জন-সাধারণ যোগ দেয়। সাম্রাজ্যবাদী শাসন লোপ করিয়া দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য উপনিবেশের জনগণ যে বিপ্লব সাধন করে, তাহাকে বলা হয় জাতীয় গণ-তান্ত্রিক বিপ্লব বা ধনিক (বুর্জোয়া) গণতান্ত্রিক বিপ্লব National Demo-cratic Revolution or Bourgeois Democratic Revolution)। যে কার্য্যক্রমকে ভিত্তি করিয়া এই বিপ্লব সাধিত হয়, যে দাবীগুলি পূরণ করিবার জন্য জনগণ এই বিপ্লবে যোগদান করে তাহার মধ্যে ধনিক, মধ্যবিত্ত, চাষী এবং

শ্রমিক প্রত্যেকেরই দাবী থাকে, তাহাদের সকলের দাবীগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া বিপ্লবের একটি সাধারণ কার্য্যক্রম (Common Programme of Action) স্থির করা হয়। স্বভাবতঃই, এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য, সাম্রাজ্যবাদী শাসন লোপ করিয়া ধনিক প্রথার পূর্ণ বিকাশের পথ পরিষ্কার করা, যাহার ভিতর দিয়া সামন্ততান্ত্রিক যুগের সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হইবে। এই কথা সত্য যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর পূর্ণস্বার্থ প্রতিষ্ঠিত হইবে না, তথাপি ইহাতে শ্রমিকশ্রেণীর যথেষ্ট স্বার্থ রহিয়াছে। উপনিবেশে শ্রমিকশ্রেণীর উপর দ্বিগুণ শোষণ চলে, সাম্রাজ্যবাদের শোষণ এবং দেশীয় ধনিকশ্রেণীর শোষণ। জাতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে শুধু দেশীয় ধনিকরাই থাকিবে এবং বিপ্লবের সাধারণ কার্য্যক্রম গৃহীত হইয়া গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে শ্রমিকদের অবস্থাও অনেকটা উন্নত হইবে। অধিকন্তু, সামাজ্যবাদী শোষণ ধ্বংস না করিলে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রশ্নই আসে না, প্রথমতঃ সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করিতে হইবে, কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে একা সাম্রাজ্যবাদের সহিত পারিয়া উঠা কোনও প্রকারেই সম্ভবপর নয়; কাজেই সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ধ্বংস করায় অন্যান্য যে সকল শ্রেণীর স্বার্থ রহিয়া গিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে একত্রিত হইয়া সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করা শ্রমিকশ্রেণীর প্রাথমিক কর্ত্তব্য। এই ঐতিহাসিক কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হইলে পর শ্রমিক বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। (শ্রমিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এক অর্থ-জ্ঞাপক; শ্রমিক বিপ্লবের ভিতর দিয়া সমাজতন্ত্রবাদ কায়েম হয়, তাই ইহাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবও বলে) কাজেই, উপনিবেশে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে পৌছাইবার পথে একটি ধাপ, ইহাকে অতিক্রম করিয়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উপস্থিত হইতে হইবে।

ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থা ধ্বংস করিবার বিপ্লবকে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলা হয় এইজন্য যে, এই বিপ্লবে মুষ্টিমেয় প্রতিক্রিয়াশীল ছাড়া জাতির সকলেরই স্বার্থ এবং তাহারা সকলেই ইহাতে যোগ দিবে; আর, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা, সমগ্র জনগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসন-ব্যবস্থা

স্থিরীকৃত করা, এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য। যেহেতু এই বিপ্লবের ভিতর দিয়া ধনতন্ত্রের চরম-বিকাশ সাধনের অবস্থা সৃষ্টি হইবে, সেইজন্য ইহাকে ধনিক গণতান্ত্রিক বিপ্লবও বলা হয়।

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে উপনিবেশের সমগ্র জনগণ যোগদান করিবে, কিন্তু ইহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে কে? জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে জাতির সকলেরই স্বার্থ, বিশেষতঃ যেহেতু ইহার ভিতর দিয়া ধনতন্ত্রের বিকাশ সাধন করিবার উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি হইবে, সেইজন্য ইহাতে ধনিকশ্রেণীর স্বার্থতো বটেই। ইহা হইতে এইরূপ মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, এই বিপ্লবে ধনিক-শ্রেণীই নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে, সে-ই অগ্রগামী হইয়া আসিবে এবং অন্যান্য শ্রেণীকে বিপ্লবে পরিচালনা করিবে। কিন্তু স্বাভাবিক মনে হইলেও এই কথা সত্য নয়। বর্ত্তমানে আন্তর্জ্জাতিক ধনতন্ত্র এতটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, উপনিবেশের শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-চেতনা ও সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর দুর্গ, সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ, সোভিয়েট ইউনিয়ান, এতটা জোরদার ও প্রভাবশালী হইয়াছে যে, এখন উপনিবেশের ধনিকশ্রেণী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে রীতিমত ভয় করে। তাহাদের আশঙ্কা এই যে, যদিও এই বিপ্লব সম্পন্ন হইলে তাহাদেরই স্বার্থ সর্ব্বাগ্রে, তথাপি শ্রেণী-সচেতন ক্ষমতাশালী শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাইতে যাইয়া তাহাদের বিশেষ কোনও লাভ থাকিবে না, আর এমন কি শ্রমিকশ্রেণীর দেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জ্জাতিক শক্তি, প্রভাব ও সচেতনতার ফলে এই জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ঢেউ যাইয়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পৌছিতে পারে, তখন সেই বিপ্লবী শক্তিকে সফলতার সহিত বাধা দিবার মত ক্ষমতা উপনিবেশের ধনিকশ্রেণীর নাই এবং ধনিকতন্ত্র আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রেও ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবার ফলে অতিরিক্ত সুবিধা করিতে যাইয়া সর্ব্বনাশ করিবার, যাহা আছে তাহাও হারাইবার আশঙ্কায় উপনিবেশের ধনিকশ্রেণী আজ ভীত ও সন্ত্রস্ত। তাহারা ভাবে—সাম্রাজ্যবাদের আমলে তবু তো আমরা শোষণ করিতে পারিতেছি, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হইলে শোষণ-

প্রথাই ধ্বংস হইবে। তাই তাহারা সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের সঙ্গে শোষণের ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া একটা আপোষ-রফা করিবার জন্য ব্যগ্র—তাহারা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব চাহে না, তাহারা সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করিতে চাহে না, উহার সঙ্গে একটা রফা করাই তাহাদের কার্য্য। জাতির স্বার্থ হইতে তাহাদের নিকট শ্রেণীস্বার্থই বড়।

আজিকার দিনে, সাম্রাজ্যবাদের মুমূর্ষু অবস্থায় জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সুরু হইলে সেই বিপ্লবের ঢেউ বহুদূর চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা—যখন ইহা আর তাহাদের আওতার মধ্যে থাকিবে না—এই ভয়ে উপনিবেশের ধনিকশ্রেণী এই বিপ্লবে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে রাজী নয়, তাহারা বরং এই বিপ্লবের পথে নানারকম বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে। অবশিষ্ট যাহারা রহিল, তাহাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত বা চাষীদের পরস্পর স্বার্থের সংঘাত থাকায়, তাহাদের সকলের স্বার্থ এক না হওয়ায় তাহারা একটা ফাটলহীন অবিভাজ্য শ্রেণী হিসাবে দাঁড়াইতে পারে না। কাজেই তাহাদের মধ্যে কেহ এই বিপ্লবে নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার পক্ষে অনুপযুক্ত, অপারগ্। শ্রমিক-শ্রেণী একটি অবিভাজ্য শ্রেণী, এই শ্রেণীর মধ্যে প্রত্যেকেরই স্বার্থ এক। এতদ্ভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শাসন ধ্বংস করিয়া জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত করা, জাতীয় স্বাধীনতা আদায় করা শ্রমিকশ্রেণীর একান্ত দরকার। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত না করিলে শ্রমিকশ্রেণী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্মুখীন হইতে পারে না, তাহাদের চরম স্বার্থ সমাজতন্ত্রবাদ-সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না; উপনিবেশের ধনিকশ্রেণীর পক্ষে যাহা লাভ লোকসানের প্রশ্ন, শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে তাহা জীবন-মরণ সমস্যা। কাজেই, উপনিবেশে শ্রমিকশ্রেণীকে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার পার্টি কমিউনিস্ট পার্টিকে জাতীয় পার্টিতে পরিণত করিতে হইবে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সকল শ্রেণীর দাবী-দাওয়ার উপরে ভিত্তি করিয়া যে সাধারণ বিপ্লবী কার্য্যক্রম স্থিরীকৃত হইবে, তাহাই হইবে উপনিবেশের কমিউনিস্ট পার্টির কার্য্যক্রম। এই কার্য্যক্রমের উপর সমগ্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলিকে একত্রিত করিয়া সম্মিলিত জাতীয় বাহিনী (United

National Front) গঠন করা এবং এই বাহিনীকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিচালিত করা শ্রমিক-শ্রেণী ও তাহার পার্টির দায়িত্ব।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, শ্রমিকশ্রেণীই যখন বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে, তখন সে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব করিবে কেন, একেবারে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই ত সাধন করা চলিতে পারে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কার্য্যক্রমকে পূরণ করিবে বলিয়াই ত অন্যান্য শ্রেণী তাহাকে নেতা বলিয়া মানিয়া লইবে। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কার্য্যক্রম ছাড়িয়া শ্রমিকশ্রেণী যদি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কার্য্যক্রম উপস্থাপিত করে, তাহা হইলে শ্রমিকশ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য সকলেই সরিয়া পড়িবে। কাজেই এই অবস্থায় বিপ্লবের জয় অসম্ভব। কিন্তু জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাধিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে গরীব চাষী প্রভৃতিও উপলব্ধি করিতে থাকিবে যে, একমাত্র সমাজতন্ত্রেই জনগণের মুক্তি, ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ না হওয়া পর্য্যন্ত শোষণ ও নিপীড়ন বন্ধ হইতে পারে না। তখন ধনিক প্রথা ধ্বংস করা নির্য্যাতিত সকলের দাবী হইয়া দাঁড়াইবে—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কার্য্যক্রম হইবে সমগ্র জনগণের কার্য্যক্রম। এই সময়ে ধনিক প্রথার বিরুদ্ধে সমগ্র নির্য্যাতিত জনগণকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালিত করা হইবে শ্রমিকশ্রেণীর কর্ত্তব্য।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, যদিও জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে উপনিবেশের ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ সর্ব্বাগ্রে, তথাপি শ্রমিক বিপ্লবের আতঙ্কে তাহারা এই বিপ্লবে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে রাজী নয়, তাহারা বরং এই বিপ্লবের বিরোধিতা করে। নিজেদের ক্ষুদ্র শ্রেণী-স্বার্থই তাহাদের নিকট বৃহৎ জাতীয় স্বার্থ হইতে বড় হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু যখন এমন অবস্থা দাঁড়াইবে যে, ধনিকশ্রেণী শত চেষ্টা করিয়াও জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে আটকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ইহা অনিবার্য্য ও অদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছে, তখন যে সমস্ত বড় বড় দেশীয় ধনিকের স্বার্থ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া

গিয়াছে তাহারা কয়েকজন ছাড়া ধনিকশ্রেণীর প্রায় সকলেই এই বিপ্লবে আসিয়া যোগ দিবে এবং বিপ্লবকে যাহাতে তাহাদের আয়ত্তে রাখিতে পারে সেইজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে—এইরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা খুব বেশী (চীনদেশে ঠিক এইরূপই হইয়াছিল)। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের অবস্থা যদি এতটা তীব্র এবং শ্রমিক-বিপ্লবের এতটা পক্ষে হয় এবং দেশের জনগণের রাজনৈতিক চেতনা যদি এতটা বাড়িয়া যায় যে শ্রমিক বিপ্লবকে এড়ান বা তাহাকে পণ্ড করা কোন প্রকারেই সম্ভবপর হইবে না—এইরূপ অবস্থায় উপনিবেশের ধনিকশ্রেণী সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়া পড়িবে। এমতাবস্থায়, সমগ্র জনগণের স্বার্থ ও কর্ত্তব্য হইবে —জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর অতিক্রম করিয়া একই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করা এবং শোষণ ব্যবস্থা চিরতরে ধ্বংস করিয়া সমাজতন্ত্র কায়েম করা।

উপনিবেশে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্বন্ধে আমরা এই পর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে কেহ যেন এইরূপ ধারণা না করেন যে, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হইলে যে অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা স্থাপিত হইবে তাহা বর্ত্তমানে প্রচলিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থারই অনুরূপ এবং সে শাসন-ব্যবস্থাও ধনিক-রাষ্ট্রেরই মত। বর্ত্তমান যুগ ধনতন্ত্রের পতনের যুগ এবং এই জন্যই উপনিবেশের ধনিকশ্রেণী বিপ্লবের সম্মুখীন হইতে সাহস পায় না। ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের এই মরণোম্মুখ অবস্থায় যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাধিত হইবে—যে বিপ্লবের পথে ধনিকশ্রেণী বাধা সৃষ্টি করিবে—সেই বিপ্লবের ভিতর দিয়া যে সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের উদ্ভব হইবে তাহা পুরাপুরি ধনিক সমাজ-ব্যবস্থা ও ধনিক রাষ্ট্র হইতে পারে না। এই বিপ্লবের সাধারণ কার্য্যক্রমের ভিতর শুধু ইহাই থাকিবে না যে, বিদেশী ধনিক ও সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের অধীনস্থ সমস্ত কলকারখানা ও অন্যান্য উৎপাদনের উপায়গুলি সমাজ-সম্পত্তিতে পরিণত হইবে। এতদ্ভিন্ন এই কার্য্যক্রমের মধ্যে ইহাও থাকিবে যে জমি, বাগান (plantations), খনি, রেল, ষ্টিমার, ব্যাঙ্ক এবং প্রধান প্রধান জাতিগঠনকারী ও মৌলিক (key) শিল্প-

প্রতিষ্ঠানগুলিও (যেমন, লোহালক্কর, অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা প্রভৃতি) জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইবে। এইগুলি জাতির সকলের সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হইবে, রাষ্ট্র হইবে এইগুলির মালিক, কোনও ব্যক্তিবিশেষ এইগুলি তাহার লাভের জন্য ব্যবহার করিতে পারিবে না, এই সকল উৎপাদনের উপায়কে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করিতে পারিবে না। অধিকন্তু, যাহারা বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করিবে তাহারা সকলে মিলিয়া ভোট দিয়া অধিকাংশের মতানুযায়ী যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করিবে, তাহাই হইবে শাসন-ব্যবস্থা এবং এই শাসন-ব্যবস্থার ভিতর দিয়া গরীব নির্য্যাতিত জনগণ ও শ্রমিকশ্রেণীর নিম্নতম অর্থ-নৈতিক দাবীগুলি পূরণ করিতেই হইবে এবং তাহাদের রাজনৈতিক সমান অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হইবে। সুতরাং যে সকল মৌলিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া ধনিকশ্রেণী তাহার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বজায় রাখে, যে সকল প্রতিষ্ঠান তাহার একচেটিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ায় সে অন্যান্য শ্রেণীগুলিকে শোষণ ও শাসন করিতে পারে, সেইগুলি ধনিকশ্রেণীর হাতছাড়া হইবার ফলে এবং শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য জনগণের নিম্নতম আর্থিক দাবীগুলি মিটাইতে বাধ্য হওয়ায় শ্রেণী হিসাবে ধনিকশ্রেণী অনেক দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। প্রকৃতপক্ষে, বড় বড় কোটীপতি ধনিকদের (যাহারা ধনিকশ্রেণীর বনিয়াদ) অস্তিত্বই লোপ পাইবে এবং ফলে রাষ্ট্রের মধ্যে ধনিকশ্রেণীর প্রাধান্য থাকিবে না, ধনিকশ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একটি ক্ষুদ্র অংশীদার হইবে মাত্র। এই বিপ্লবের ফলে যে অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা আসিবে তাহাতে চাষী, দোকানদার, ব্যবসাদার ও ছোটখাট শিল্পের মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বজায় থাকিবে, তাহারা অন্যকে খাটাইয়া (অবশ্য রাষ্ট্রের সাধারণ নিয়মগুলি পালন করিয়া, যেমন নিম্নতম বেতন প্রভৃতি) মুনাফা সৃষ্টি করিতে পারিবে। কাজেই এই বিপ্লবের ফলে ধনিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা লোপ পাইবে না, কতকগুলি সর্ত্ত মানিয়া চলিতে থাকিবে। লেনিন এই রকম রাষ্ট্র ব্যবস্থার নাম দিয়াছেন "শ্রমিক ও চাষীদের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব" Democratic Dictatorship of Workers and Peasants)। ইহার অর্থ এই যে, এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়

শ্রমিক ও চাষীদের ক্ষমতাই থাকিবে সকলের চাইতে বেশী, তাহারাই হইবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বড় অংশীদার। শ্রমিক, চাষী ও মধ্যবিত্তদের (ক্ষুদ্র ধনিক প্রভৃতি) জন্য এই শাসন-ব্যবস্থা গণতন্ত্র এবং যাহারা ইহার শত্রু তাহাদের পক্ষে ইহা একনায়কত্ব।

সফল জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভিতর দিয়া যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উদ্ভব হইবে তাহা হইল "শ্রমিক ও চাষীদের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব"। ইহার মধ্যে অবশ্য মধ্যবিত্তরাও আছে—অর্থ-নৈতিক অবস্থান হিসাবে তাহারা (সহরের মধ্যবিত্তরা) চাষীদের (বিশেষতঃ মধ্য ও ধনী চাষীদের) সমপর্য্যায়ভুক্ত। এই-রূপ অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হইলে বিশিষ্ট ধনিকদের স্বার্থের হানি ঘটিবে বলিয়া উপনিবেশের ধনিকশ্রেণীর পূর্ব্ব হইতেই জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে এবং তাহারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করিবার জন্য এতটা ব্যগ্র।

প্রশ্নমালা

১। উপনিবেশ কাহাকে বলে? কয়েকটা উপনিবেশের নাম বল।

২। উপনিবেশের শাসন ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হয় কি ভাবে? ইহাতে কি দেশীয় জনগণের হাত থাকে?

৩। ফ্যাসিস্ট শাসন ব্যবস্থা ও ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য কি?

৪। সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ হইতে দেয় না কেন? বিস্তারিত আলোচনা কর।

৫। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব কাহাকে বলে? ইহাকে ধনিক গণতান্ত্রিক বিপ্লবও বলা হয় কেন?

৬। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কোন্ শ্রেণীর স্বার্থ কিরূপ? এই বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ কি? চাষীদের?

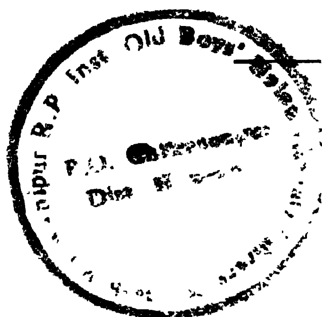
৭। উপনিবেশের ধনিক শ্রেণী জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব গ্রহণ না করিয়া বরং ইহার পথে বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করে কেন? বিস্তারিত আলোচনা কর।

৮। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে কে? কেন?

৯। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভিতর দিয়া না গিয়া একেবারেই কি শ্রমিক বিপ্লব সমাধান করা সম্ভবপর নয়? জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাধারণ কার্য্যক্রম কি?

১০। ধনিকশ্রেণী কি জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে যোগ দিবে? বিশদভাবে আলোচনা কর।

১১। "শ্রমিক ও চাষীদের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব" কি? ইহা কখন, কি ভাবে স্থাপিত হইবে?



পরিশিষ্ট

১৯৪১ সালের ২২শে জুন অকস্মাৎ শ্রমিক-কৃষকের রাষ্ট্র সোভিয়েটের উপর নাৎসী আক্রমণ সুরু হয়। হিটলারের বিশ্বজয়ের পথের প্রধান অন্তরায় ছিল সোভিয়েট—তাই অতর্কিতে এই আক্রমণ!

সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে এই আসুরিক সংগ্রামের তুলনা মিলিবে না! সেদিন সমস্ত বিশ্ব বিস্ময়ে হতবাক হইয়া দেখিয়াছিল সভ্যতার শত্রু ফ্যাসিজমের সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদের মরণ বাচন সংগ্রাম। সোভিয়েটের অলৌকিক আত্মত্যাগে আর লালফৌজের অমিত তেজের নিকট অবশেষে হিটলারের দানব শক্তিকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। গত ১৯৪৫ সালের ৮ই মে সেই জন্যে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে! ঐ দিনই ফ্যাসিস্টশক্তি সোভিয়েট ও ইঙ্গ-মার্কিণ মিত্র পক্ষের নিকট বিনাসর্ত্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিল।

কিন্তু আজ আমাদের মনে এই ভাবটিই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে যুদ্ধ জয় হইলে কি হইবে—সে জয় তো আমাদের নয়! জাতীয়তাবাদীদের ধারণা এই যে, ইহাতে আমাদের দাসত্ব শৃঙ্খল আরও দৃঢ়তর হইল। একথা তাহারা এমন ভাবে বলেন যেন ইহা একেবারে স্বতঃসিদ্ধ—যুক্তিতর্কের আর কোনই অবসর নাই! তাঁহারা এই যুদ্ধজয়ের ভিতর দিয়া সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র সমূহেরই শক্তিবৃদ্ধি হইয়াছে মনে করেন। এবং সোভিয়েটকেও তাঁহারা সাম্রাজ্যবাদীর দলে ফেলিয়া দিতে চাহেন। এবং অবশেষে তাঁহারা—যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা করিতেছেন তাহাতে একদিকে থাকিবে বৃটেন ও আমেরিকা, অন্যদিকে সোভিয়েট!

এই চিন্তাধারার অন্তসারশূন্যতা দেখাইয়া দিবার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল উপায় হইতেছে এরূপ জবাব দেওয়া যে, হুইস্কি রসে মত্ত ক্ষমতার নেশায় পাগল কাঠখোট্টা সিবিলিয়ানরাও একথাই বলে।

জাতীয় হীনতা বোধ আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন ; চিন্তার সহিত বাহিরের বাস্তবের কোনও সম্পর্ক নাই। আজ অন্য সবদেশে স্বাধীনতার উপাসকরা ভাবিতেছে এক কথা, আর ভারতের স্বাধীনতাকামীরা ভাবিতেছে অন্য কথা। একের কাছে এই স্বাধীনতার যুদ্ধ হইতেছে "জনযুদ্ধ"—অপরের কাছে ইহা ফাঁকাবুলি মাত্র। অন্যান্য যুদ্ধের সহিত ইহার পার্থক্য আমাদের নজরে পড়িতেছে না।

গত যুদ্ধে আমরা কি পাইয়াছিলাম? জালিয়ানওয়ালাবাগ আর রাউলাট এ্যাক্ট।

দুই দিক দিয়া এযুদ্ধের সহিত আগের যুদ্ধের তফাৎ রহিয়াছে। প্রথমটি হইতেছে যে, আজ বিজয়ী শিবিরে আছে সোভিয়েট, আর দ্বিতীয়টি এই যে, এবার জনগণ যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

আর একটু তলাইয়া দেখা যাউক। সোভিয়েট কি অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের মতই না আলাদা? এই যুদ্ধের প্রকৃত নেতা কে? আর এই যুদ্ধের ফলে কি জনগণের কোনও সুবিধা হইয়াছে?

এ প্রশ্ন কটির উত্তরের উপরেই যুদ্ধের সত্যি কার বিজয় হইল—তাহা নির্ভর করিতেছে।

প্রথমতঃ এ যুদ্ধজয়ের প্রধান গৌরব সোভিয়েটের প্রাপ্য। লালফৌজই লড়িয়াছে সবচাইতে বেশী। হিটলারের সব চেয়ে বড় বাহিনীকে তাহারাই ঠেকাইয়াছিল। লালফৌজ শুধু সবচাইতে বেশী সৈন্যের সঙ্গে লড়ে নাই উল্লেখ-যোগ্য খণ্ড যুদ্ধেও (battle) তাহারাই বুকের রক্ত দিয়া যুদ্ধের মোড় ফিরাইয়াছে। যুদ্ধের সম্মান যদি আজ ভাগ করিয়া দেওয়া হয় তো সেরা সম্মান পাইবে লালফৌজ। যে-রাষ্ট্র এমন সেনাবাহিনী গড়িয়াছে—সেই সোভিয়েট রাষ্ট্রই সম্মিলিত জাতিসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান বলিয়া পরিগণিত

হইবে। বৃটিশরা আমাদের মাথার উপর বসিয়া আছে বলিয়া আমরা পূর্ব্বে ভাবিতাম যে তাহারা বুঝি জগতের মাথায় বসিয়া আছে। ২৫ বছর পূর্ব্বে তাহা সত্য হইলেও আজ আর সে চিত্র সত্য নহে।

সোভিয়েটের যুদ্ধজয়ের প্রেরণার উৎস কোথায়? সোভিয়েট নাগরিক শ্রমিক। এমনটি আর কোথাও নাই। ইহারা শোষণের হাত হইতে মুক্ত। অন্যদেশের লোকের চাইতে ঢের বেশী স্বাধীনতা ইহাদের আছে। বহু বিভিন্ন জাতির লোক হইলেও তাহাদের সকলেরই সমান অধিকার। বড় জাতি-গুলি ছোট জাতির উপর মুরুব্বিয়ানা ও কতৃত্ব না ফলাইয়া তাহাদের সাহায্য করে। এই জন্যই সব জাতির মধ্যে ভাই ভাই ভাবটি পুরোপুরি বজায় আছে। তাহারা যেন এক সুখী পরিবার।

সোভিয়েটের অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের প্রয়োজনের মুখ চাহিয়া জিনিস উৎপন্ন হইতেছে। মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির লাভের জন্য নহে। এত প্রশস্ত ভিত্তির উপর শাসনতন্ত্র অন্য কোনো দেশে গড়িয়া উঠে নাই।

যুদ্ধের গতি পর্য্যালোচনা করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বৃটেন ও আমেরিকার পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের চেয়ে সোভিয়েট গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ।

পশ্চিমের যে মিত্র শক্তি সোভিয়েটের সাহায্য ব্যতিরেকে যুদ্ধ জয় করিতে পারিল না তাহারা যুদ্ধ জয়ের পর কি করিয়া নিজের মরজি মত কাজ করিবে? চাৰ্চ্চিল আমাদের লইয়া খেলা করেন বলিয়া কি সর্ব্বত্রই তাঁহার খেলা সফল হইবে! তাহা নহে।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় সোভিয়েটকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সমাজ সংগঠনে তাহার দান স্বীকৃত হইতে বাধ্য! কারণ সোভিয়েট নিজে যাহা চায় জগতের অপর সকলের জন্যেও সে তাহাই দাবী করিতেছে। সোভিয়েট নেতারা প্রত্যেকটি ঘোষণায় জানাইয়াছেন যে তাহা-দের লক্ষ্য হইতেছে সর্ব্বজাতির স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও শান্তি। তাঁহাদের এসব ঘোষণা ফাঁকা বুলি নহে। যেমন সুযোগ আসিয়াছে, পথ যখনই খোলা পাওয়া গিয়াছে, তখনই সোভিয়েট এই নীতিকে কার্য্যকরী করিয়াছে।

সোভিয়েটের সার্থক প্রতিরোধের পর সব স্বাধীনতাকামী দেশের লোকেরাই প্রশ্ন করিতে শুরু করিলেনঃ সোভিয়েট যাহা করিয়াছে আমরা কেন তাহা পারিব না? এই প্রশ্ন মনে জাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হইল ইউরোপের মুক্তি-যুদ্ধ!

সোভিয়েটের জ্বলন্ত দেশ-প্রেম অন্য দেশে দেশ-প্রেম জাগাইয়া তুলিল! তাহারাও যুদ্ধ শুরু করিল। লালফৌজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই সেই সব দেশপ্রেমিক গেরিলারা তাহার সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছিল।

সোভিয়েট ও মিত্র পক্ষের মনোভাবের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। মিত্র পক্ষ গেরিলাদের সাহায্য নিয়া যেই শত্রু পরাজিত করিল, অমনি আরম্ভ করিল গেরিলাদের নিরস্ত্র করিতে। আর লালফৌজ শত্রুকে পরাজিত করিয়া গেরিলা-দের হাতে দিল আরও অস্ত্র শস্ত্র।

সোভিয়েট ও ইঙ্গ মার্কিণ নীতির পার্থক্য ক্রমেই ফুটিয়া উঠিতেছে। সোভি-য়েট সমস্ত দেশেরই মুক্তি আন্দোলনকারীদের সরকারকে মানিয়া লইতেছে। কিন্তু ইঙ্গ আমেরিকানরা মুক্তি আন্দোলনকারীদের পাশ কাটাইয়া যাইতেছে। তাহারা চাহিতেছে আগের প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা!

ফ্রান্সেও মিত্রশক্তি ফ্যাসিস্ট সহায়কদের সাহায্যে জার্মানীকে পরাজিত করিতে চাহিয়াছিল। প্রথমে দারলাঁ, তারপর জিরো! কিন্তু সোভিয়েট প্রথম হইতেই দ্য গলকে মানিয়া লইয়াছিল।

যুগোশ্লাভিয়ায় মিত্রপক্ষ প্রথমে দেশদ্রোহী মিহাইলোভিচকে সাজান দেশ-নেতা বলিয়া; আর টিটোকে বলেন কমিউনিস্ট দস্যু! কিন্তু চাকা ঘুরিয়া গিয়া টিটোই হইয়াছেন দেশ নেতা। সোভিয়েট তাঁহাকেই মানিয়া লইয়াছে।

ইটালীতে প্রথমে পুরাপুরি ইঙ্গ মার্কিণ সামরিক রাজত্ব চালানো হইয়াছিল। তাহার পর ফ্রান্সের জিরোর মত বাদোলিয়োকে খাড়া করানো হয়। সর্বশেষে আসিল জাতীয় সরকার। তাহাকেও প্রথমে সোভিয়েটই মানিয়া লয়।

চেক প্রেসিডেণ্ট বেনেস যাহাতে সোভিয়েটে না যান তাহার জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি আর ব্রিটিশ ধাপ্পাবাজীতে ভোলেন নাই। সোভিয়েটই প্রথম তাহাকে সাহায্য দিয়াছে !

বল্কানেও ইঙ্গ আমেরিকান কুটনীতি খাটে নাই। সোভিয়েট আগে হইতেই সেখানে উল্টা চাল দিয়াছিল।

গ্রীসে ব্রিটিশ বেয়নেটের সহায়তায় একটি ফ্যাসিস্ট সরকার এখনো কায়েম আছে।

ইওরোপে ইঙ্গ মার্কিণ পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করে নি ! স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত বলিয়াই ইহা ব্যর্থ হয় আর গণমুক্তির সহায়ক বলিয়াই সোভিয়েট পরিকল্পনা সার্থক হইয়াছিল ইওরোপে।

মুক্তিপ্রাপ্ত সমস্ত দেশের নেতাই আজ সোভিয়েটকে অভিনন্দন জানাইতেছে। অথচ তাহাদের মনোভাব না জানিয়া আমাদের জাতীয় সংবাদপত্র সমূহ সোভিয়েটের মুক্তিকামী উদ্দেশ্য না বুঝিয়া বলিতেছে যে সোভিয়েটও ইওরোপে নিজ সীমানা বাড়াইতে চায়।

ধনিকরা দেখাইতে চায় যে সোভিয়েটও তাহাদেরই মত এক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র। আর আমরা ইংরাজ ও আমেরিকার মত শক্তিশালী দেশের মতিগতি খুব ভাল করিয়া বুঝি বলিয়াই কখনও বিশ্বাস করিতে পারি না যে, পৃথিবীতে কোন নিঃস্বার্থ রাষ্ট্রও থাকিতে পারে।

কিন্তু একথা ঠিক যে ইঙ্গ মার্কিণ শক্তিকে যুদ্ধোত্তর কালে ভয়াবহ অর্থনৈতিক অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে ! তখন আর আগের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া কখনই সম্ভব হইবে না। জাতীয় পুনর্গঠনের পরিকল্পনাকে কাজে লাগাইয়া, দেশের ভিতরের বাজারের প্রসার করিয়া, উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দিয়া বিদেশের বাজার সম্প্রসারিত করিয়া তাহাদের সে অর্থ নৈতিক সঙ্কটে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। স্বাধীন ভারত বাজার হিসাবে হইবে অনেক ভাল !

সেজন্যেই বৃটিশ জনগণের অন্নবস্ত্রের সংগ্রামের সহিত ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন ভাল ভাবে জড়িত !

যে যুদ্ধোত্তর জগতের দ্বারে আমরা আসিয়া পড়িয়াছি—সে জগতে শান্তি, প্রাচুর্য্য, ও স্বাধীনতা পরস্পর নির্ভরশীল। আজ জগতের জাতিগুলিও পূর্ব্বের ন্যায় তন্দ্রালস নহে, তাহারাও হইয়াছে সুসংগঠিত।

সোভিয়েট জার্ম্মান যুদ্ধের প্রথমে ইঙ্গ সোভিয়েট চুক্তিতে অনেক জাতীয়তা-বাদী বলিয়াছিলেন যে দায়ে ঠেকিয়া সোভিয়েটকেও ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে হাত মিলাইতে হইয়াছে। তাহার একার কোন ক্ষমতাই ছিল না হিটলারকে ঠেকাই-বার। আজ তাঁহারা নিশ্চয়ই নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন।

কিন্তু যুদ্ধজয়ের পর আবার ইঁহারাই পরাজয়ের সুরে কথা কহিতেছেন। তাঁহারা প্রশ্ন করেন যে আমরা স্বাধীন হইতে পারিলাম না কেন তাহা হইলে?

ইহার কারণ এই যে গত চার বৎসর ভারতের জাতীয় আন্দোলন বিশ্বব্যাপী মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে পা মিলাইয়া চলিতে পারে নাই। আমরা প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম যে শাসকরা সাহায্য করিবে। কিন্তু শাসকরা সাহায্য করে নাই। তাই আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি!

তবে দেখিয়া ও ঠেকিয়া শিখিবার সময় যায় নাই। স্বাধীনতার সংগ্রাম কখনো নষ্ট হয় না। সংগ্রাম চলিয়াছে। এখন সর্ব্বশক্তি সংহত করিয়া সেই সংগ্রামে যোগ দেওয়া প্রয়োজন।

